কামিনীকাঞ্চন

অন্নদাশঙ্কর রায়

কাশ্মীরকাহিনী

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

হুমায়ুন কবির

বন্ধুবরেষু

নিবেদন

এই গল্প-সংগ্রহের অধিকাংশ স্থলে আমি নিজেকে প্রক্ষেপ করেছি। তা বলে এগুলি আত্মজীবনীর অঙ্গ নয়। চরিত্রগুলি কাল্পনিক। গল্প লেখার একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে গিয়ে এ রকম হয়েছে। এই পদ্ধতির এইখানেই ইতি।

১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১ — অন্নদাশঙ্কর রায়

কা মি নী কা ঞ্চ ন

সূচী

কামিনীকাঞ্চন

১

ডাক্তার বললেন, "ভালো কথা, আপনার কাছে মডার্ন ফিলসফির নতুন বই থাকলে পড়তে দেবেন? আমাদের এই মফঃস্বল শহরে আর কে আছে! কার শরণাপন্ন হব!" তাঁকে খুব চিন্তিত বোধ হচ্ছিল।

আমি মনে করেছিলুম ডাক্তারের হঠাৎ দার্শনিক হবার শখ হয়েছে। পরিহাস করে বললুম, "বিশ্বরহস্য ভেদ করতে চান বুঝি?"

"আরে নাঃ। আমি ওসবের ধার ধারিনে। খাই-দাই ফুর্তি করি। হবে এক দিন আপনার সঙ্গে তত্ত্বালোচনা।"

"তবে বই নিয়ে কী করবেন?"

"আমার জন্যে নয়। আমাদের হাসপাতালে একটি ইণ্টারেস্টিং কেস এসেছে। কেসটা ইণ্টারেস্টিং নয়। মানুষটি ইণ্টারেস্টিং। বিখ্যাত বিদ্বান, অথচ আরণ্যক সন্ন্যাসী। আপনি হয়তো তাঁর নাম শুনেছেন।"

আমি চমৎকৃত হয়েছিলুম। জানতে চাইলুম, কী নাম।

"ডক্‌টর বড়োদেকর। এ নাম তাঁর গৃহস্থ আশ্রমের। এখন তিনি স্বামী বিদ্যানন্দতীর্থ।"

"কোন বড়োদেকর? সেই যিনি অক্সফোর্ডে ছিলেন?"

"তিনিই! তা হলে আপনি সব জানেন দেখছি।"

নাম ছাড়া আর বিশেষ কিছু জানতুম না। কবে তিনি সন্ন্যাসী হলেন, কেন হলেন, জানতে ইচ্ছা ছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, "কী হয়েছে তাঁর? এখানে এলেন কী করে?"

"সায়াটিকা। চলুন না এক দিন দেখতে। বলেন তো আজকেই নিয়ে যেতে পারি। আমি হাসপাতালেই যাচ্ছি।"

আগ্রহ ছিল, কিন্তু সময় ছিল না, বললুম আরেক দিন যাব।

খান কয়েক বই বার করে তাঁর হাতে দিলুম। বইগুলো মডার্ন কিন্তু ফিলসফির নয়। তবু ডাক্তার সেগুলো নিলেন। বললেন, "ধন্যবাদ, বড় বিপদে পড়েছিলুম। কিন্তু—"

তিনি ইতস্তত করছিলেন। আমি একটু চাপ দিতেই বললেন, "একটা নেশা তো মিটল। আরেকটা মিটবে কী করে তাই ভাবছি।"

আমাকে কৌতূহলী দেখে মুচকি হাসলেন। "আপনার কাছে প্রকাশ করতে সাহস হয় না। হাসপাতালের সুনাম নষ্ট হবে। কিন্তু কী করি, সাধুসন্ন্যাসীর বেলা নিয়মকানুন খাটে না।"

আমার কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললেন, "গাঁজা।"

আমি হোহো করে হেসে উঠলুম। বললুম, "তার পরে ?"

"রোজ রোজ জোগাড় করি কার কাছে!" তিনি আবার চিন্তান্বিত হলেন।

"কেন ? শহরে কি আর কোনো সাধুসন্ন্যাসী নেই ?" আমি তামাশা করলুম।

"হুঁ।" তিনি আর উচ্চবাচ্য না করে গাড়িতে উঠলেন।

আমি বিস্মিত হয়ে ভাবতে বসলুম, এ কী কাণ্ড! যিনি অক্স্‌ফোর্ডের বিশিষ্ট বিদ্বান তিনি আরণ্যক সাধু। যিনি মডার্ন ফিলসফির নতুন বই পড়েন তিনি গঞ্জিকাসেবী। যাক, এঁকে পাওয়া গেছে বাংলাদেশের এক প্রান্তে এক অখ্যাত ছোট শহরে। দেখতে যেতে হবে। শুনতে হবে এঁর বিচিত্র কাহিনী।

ডাক্তারকে চিঠি লিখে এক দিন হাসপাতালে হাজির হলুম। সাধুজী শয্যাশায়ী ছিলেন জেনারেল ওয়ার্ডের এক কোণে। যে রোগী খরচা দিতে পারবে না তার জন্যে ওর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কী হতে পারে! বিনা খরচার রোগী হলেও সকলের দৃষ্টি তাঁর উপরে। তিনি কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ করলে অমনি কেউ না কেউ ছুটে আসে।

আমার কুশল প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "খুব ভালো আছি। এঁরা আমাকে রাজার হালে রেখেছেন।"

ডাক্তার তা শুনে সবিনয়ে বললেন, "আমাদের সাধ্য থাকলে আমরা আপনাকে বাদশার হালে রাখতুম। আর কয়েকটা দিন একটু কষ্ট ভোগ করতে হবে।"

"কষ্ট ভোগ করব বলেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি। আপনারা যদি কষ্ট ভোগ করতে না দেন তা হলে সব বৃথা হবে।" এই বলে তিনি কৌতুকহাস্য করলেন।

শুনলুম তিনি নিজের দোষেই এ রোগ বাধিয়ে বসেছেন। গিয়েছিলেন পদব্রজে জগন্নাথ দর্শন করতে। হরিদ্বার থেকে জগন্নাথ। হরিদ্বারের উত্তরে এক গুহা আছে, সেখানে তিনি ও তাঁর গুরুভ্রাতারা থাকতেন। টিহরির মহারাজার কৃপায় সেখানে এখন বিজলির আলো হয়েছে। প্রাচীন ও আধুনিকের এমন সমাবেশ অন্যত্র বিরল। ইংরেজী সংস্কৃত হিন্দী বই কাগজের অভাব নেই। তপস্যার দিক থেকে আদর্শ স্থান। তীর্থোপলক্ষে মাঝে মাঝে নিষ্ক্রমণ করতে হয়। পারতপক্ষে পদব্রজে।

পায়ে হেঁটে কাশী পর্যন্ত আসার অনুমতি পেয়েছিলেন। খেয়াল হলো গয়া দেখবেন। পায়ে হাঁটলেন। সেখান থেকে ফিরে গেলেই

পারতেন। কিন্তু সাধ জাগল রথযাত্রার সময় জগন্নাথ দেখবেন। আবার পায়ে হাঁটলেন। নিজের ক্ষমতার উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস থেকে এই বিপত্তি। পুরীর হাসপাতালে বেশী দিন রাখল না।

আরো দু'তিনটা হাসপাতাল ঘুরে অবশেষে এসেছেন এখানকার হাসপাতালে। এঁরাও বেশী দিন রাখতে রাজি নন। রেলভাড়া সংগ্রহ করে বেহারের কোনোখানে গিয়ে সেখানকার হাসপাতালে ভর্তি হবেন। পায়ে হাঁটার উপায় নেই। রেলপথেই হরিদ্বারে ফিরবেন। তার পরে তাঁর গুহায় ঢুকবেন।

বললেন, "এমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই যার থেকে কিছু না কিছু লাভ করা যায়। এই যে আমি চলৎশক্তি হারিয়ে জড়ের মতো পড়ে আছি এও ভালো। আপনার মতো সজ্জন এসেছেন আমাকে দেখতে। বই পাঠিয়ে দিয়েছেন, পড়ে আনন্দ পাচ্ছি। সোয়াইটসারের বই এই প্রথম পড়ছি। অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ হলো।"

সোয়াইটসার সম্বন্ধে দু'চার কথার পর আমি বিদায় নিলুম। বললুম, এখান থেকে চলে যাবার দিন আমার ওখানে আহারের নিমন্ত্রণ রইল। খেতে খেতে আলাপ করা যাবে। আপনার আরোগ্য কামনা করি।"

সোয়াইটসারের বই আরো দু'একখানা ছিল। পাঠিয়ে দিলুম।

২

মাস খানেক পরে তিনি আমার বাড়ী এলেন রিক্শা করে। তাঁকে ধরাধরি করে নামাতে হলো, নিয়ে যেতে হলো বসবার ঘরে। বসবার ঘরের মেজে এত পিছল যে একজন অতিথি একবার পা পিছলে পড়ে গেছলেন, কাজেই তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিতে হলো।

জজের বাড়ির বিশেষত্ব ছিল চার দিকের খোলা বারান্দা। যেমন ফাঁকা তেমনি চওড়া। অথচ পিছল নয়। স্বামীজীকে বলায় তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। দু'জনে গিয়ে বারান্দায় দু'খানা ইজি চেয়ারে গা মেলে দিলুম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

বললুম, "আমি কিন্তু আপনাকে স্বামীজী বলে ডাকব না। ডাকব ডক্টর বড়োদেকর বলে। এত বড় একজন ইনটেলেকচুয়ালের এই পরিণতি আমি মেনে নিতে পারছিনে।"

তিনি মিষ্টি হাসলেন। বললেন, "ওসব পূর্বজন্মের মতো লাগে। মনে পড়লেও মনে আনতে চাইনে।"

দার্শনিক আলোচনা করতে করতে যতবার আমি তাঁর গৃহস্থ আশ্রমের প্রসঙ্গ তুলি ততবার তিনি বলেন, "সাধুদের ওসব বলা বারণ!"

তাঁর জন্যে খৈ দুধ ফলমূল মিষ্টান্ন তৈরি ছিল। ওখানেই টিপয় পেতে আহারের আয়োজন করে দেওয়া হলো। জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনার কি প্রকৃতি সম্ভাষণ করা নিষেধ?"

"না। তা কেন হবে? আমরা আধুনিক সন্ন্যাসী।"

তখন আমার স্ত্রী এলেন তাঁর খাবার হাতে করে।

খেতে খেতে বললেন, "গৃহস্থের বাড়ি কতবার অতিথি হয়েছি। সত্যিকারের ধর্মপরায়ণতা দেখেছি সাধুদের চেয়ে গৃহস্থের মধ্যেই। শুধু ধর্মপরায়ণতা নয়, আধ্যাত্মিক উন্নতিও।"

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললুম, "তা কেমন করে সম্ভব! গৃহস্থরা যে কামিনীকাঞ্চনের পাশবদ্ধ। তারা তো মুক্ত জীব নয়।"

"আমার অভিজ্ঞতা অন্যরূপ।" তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "গুহায় যারা থাকে তাদের সম্বন্ধে বাইরের লোকের ধারণা যত উঁচু আসলে তারা

তত উঁচু নয়। তাদের মূল্যবোধ বিকৃত। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করেছে বলে যাদের গর্ব তারা কামিনীকাঞ্চনকেই সব চেয়ে মূল্যবান মনে করে।"

আমরা শুনছিলুম। তিনি বলতে লাগলেন, "দু'বেলা যারা ভোজনের কথা ভাবে, পেট না ভরলে যাদের মন খারাপ হয়, তারাও বদ্ধ জীব। তবে তারা একঠাঁই আবদ্ধ নয়। তারা যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারে। তাদের সম্পত্তি নেই। সম্পত্তির টান তাদের টেনে রাখে না। তাদের পরিবার নেই। পরিবারের বাঁধন তাদের বেঁধে রাখে না। এই যা তফাৎ।"

আমি বললুম, "এ কি সামান্য তফাৎ!"

"সামান্য নয়। তা বলে এমন কিছু অসামান্যও নয়। মানবজীবনের যে দু'টো অভিশাপ গৃহস্থকে জ্বালায় সে দু'টো সাধুকেও জ্বালাতন করে। হাওয়া খেয়ে কেউ বাঁচে না। অন্তত এক বেলা আহার না করলে সাধনায় অগ্রসর হওয়া যায় না। অপর অভিশাপটার কথা নাই বা বললুম।"

আমার স্ত্রী উঠে গেলেন। আমি বললুম, "তা হলে সাধু হয়ে এমন কী পরিবর্তন হলো! গৃহস্থ-আশ্রমে ফিরে গেলে এমন কী ক্ষতি!"

"ফিরে যাবার পথ নেই। যেতেও চাইনে। তবে সাধু হয়েছি বলে মুক্ত জীব হয়েছি এ অহঙ্কার আমার নেই। কারুর থাকা উচিত নয়।"

আহারের পর লক্ষ্য করলুম তিনি আইঢাই করছেন। জিজ্ঞাসা করলুম, "পান ইচ্ছা করেন কি?"

"না।"

"সিগারেট?"

"না, ধন্যবাদ।"

কিছুক্ষণ পরে একটি ছাত্র এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইল। তিনি বললেন, "এবার আমার একটু নির্জনতা দরকার। ছাত্রটিকে আসতে দিন।"

আমি সরে গেলুম। ছাত্রটি এলো। কী একটা দিয়ে গেল তাঁকে। তিনি তাই নিয়ে বুঁদ হলেন। গন্ধ থেকে বুঝতে পারলুম কী ওটা। গাঁজা সোসাইটির ভাইসচেয়ারম্যান ছিলুম। ও গন্ধ আমার চেনা। গাঁজা সোসাইটি শুনে আপনারা ভাবছেন গাঁজাখোরদের সংঘ। তা নয়। গাঁজাচাষীদের সমবায়।

গাঁজার ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেল। গৃহিণী অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, "অক্স্‌-ফোর্ডের ডক্টর। তাঁর এমন স্বভাব!"

আমি বললুম, "অক্স্‌ফোর্ডের ডক্টর যখন ছিলেন তখন ছিলেন। এখন গুহাবাসী সাধু। রোমে গেলে রোমানদের মতো ব্যবহার করতে হয়।"

তিনি অনুমোদন করলেন না। তখন তাঁকে খুলে বলতে হলো যে দ্বিতীয় অভিশাপের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সাধুরা সাধারণত এই তৃতীয় অভিশাপের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এটা মার্জনীয়।

৩

এর পরে এক সময় স্বামীজী আমাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি তিনি উদাস হয়ে বসে আছেন। গাঁজা ফুরিয়ে গেছে। ছিলিম সরিয়ে রেখেছেন।

আমি চুপ করে নিজের চেয়ারে আসন নিলুম।

তিনি আপনা থেকে বললেন, "ডক্টর বড়োদেকরকে এই অবস্থায়

দেখে আপনার হয়তো চমক লাগছে। তাঁরও লাগত, যদি তাঁর জীবন অন্য রকম হতো। এক কালে সাধু সন্ন্যাসীদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করেছি। জানতুম না যে নিয়তি আমাকে এক দিন তাঁদেরই একজন করবে। নিয়তির রসিকতা যাকে বলে।”

মৌতাত জমে উঠেছিল। মনে ছিল না যে সাধুদের এসব বলা বারণ।

“আপনি কখনো অক্‌স্‌ফোর্ডে গেছেন?”

“হাঁ।”

“আমার কলেজের নাম ক্রাইস্টচার্চ। কী সুখেই কেটেছে সেই ক'বছর। যুদ্ধের পরে সেখানে যাই। বড় ঘরের ছেলে। টাকার ভাবনা ছিল না। টাকা না থাকলে অক্‌স্‌ফোর্ডে যাওয়া ভুল। প্রথম কয়েক বছর পার্টি দিয়েছি, পার্টিতে গেছি, মেলামেশার চূড়ান্ত করেছি। কিন্তু বরাবরই আমি ছিলুম আত্মকেন্দ্রিক। চিন্তা করতুম, চিন্তা করে যে আনন্দ পেতুম সে আনন্দের তুলনা নেই। রাত জেগে বই পড়তুম। বই পড়ে যে আনন্দ পেতুম সেও অতুলনীয়। কাজেই আমার ঝোঁক পড়ল ভালো ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে অদ্বিতীয় হতে। হলুম অদ্বিতীয়।”

আমি নীরবে শুনছিলুম। বাধা দিলুম না।

“আমার গুরুজনের ইচ্ছা ছিল আমি সিভিল সার্ভিসে যোগ দিই। কিন্তু অত শীগগির অক্‌স্‌ফোর্ড ছাড়তে আমার ইচ্ছা ছিল না। সেইজন্যে ইচ্ছা করে সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় খারাপ করলুম। গুরুজন অবাক হলেন, রাগ করলেন। হুকুম দিলেন ব্যারিস্টারি পড়তে। তাতেও দেখা গেল আমি ফেল।”

"কিন্তু ফেল করতে তো কোনো দিন কাউকে দেখিনি!"

"হাঁ, ফেল করা কষ্টকর। তার জন্যে আমাকে বেশ মাথা খাটাতে হয়েছে। রোমান আইনের প্রশ্নের উত্তরে লিখতে হয়েছে মেটাফিজিক্স্।"

আমি হাসি চাপতে পারলুম না। তিনি তেমনি উদাসভাবে বলে চললেন, "ডকটরেট পেয়ে দেশে ফিরলুম, কিন্তু সরকারী চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলুম। তখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেছে। দেশের আবহাওয়া বদলে গেছে। গান্ধী মহারাজ জেলে। প্রাইভেট কলেজে কম বেতনের কাজ নিলুম। গুরুজন তা দেখে বিষম খাপ্পা। আমার পিছনে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছে সেটা যে একটা ইনভেস্টমেণ্ট এ-জ্ঞান আমার ছিল না। হলো, যখন গুরুজন সে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন। মা'র উপর ভার পড়ল আমার জন্যে বড় ঘরের মেয়ে দেখার। লোকসান যাতে পুষিয়ে যায় এক ভাবে না হোক অন্য ভাবে।"

একটু থেমে বললেন "আমার উচ্চাভিলাষ ছিল আমি হব ভারতের অদ্বিতীয় দার্শনিক। আমার কাজে আমাকে সাহায্য করবে এমন কোনো সহধর্মিণী পেলে বিবাহ করতে আপত্তি ছিল না। লণ্ডনে একটি মেয়ে পড়ত। আমাদেরই সমাজের মেয়ে। তার সঙ্গে বিয়ে হলে সে হতো আমার উপযুক্ত সঙ্গিনী। কিন্তু তারা সম্ভ্রান্ত নয়, তাদের টাকা নেই, তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে আমার গুরুজনের আপত্তি ছিল। মেয়েটি সুন্দরী নয়, তার বয়সও বৌ-মানুষের পক্ষে একটু বেশী। এই কারণে মা তার উপর বিমুখ হলেন। আমি দার্শনিক হতে চাই শুনে হিতৈষীরা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন। তাঁরা এমন মেয়ের সন্ধান

করলেন যে আমাকে সংসারী করবে, লক্ষ্মীমন্ত করবে। আমি তখন বেঁকে বসলুম। বলে দিলুম বিয়ে করব না।"

তাঁর স্বর ক্রমে বিকৃত হয়ে আসছিল। গাঁজা খেলে যা হয়।

"এই ভাবে কয়েক বছর কাটল। মা দেখলেন আমাকে সংসারী করার উপায় নেই। তখন অসুখে পড়লেন। খুব সম্ভব অসুখটা তাঁর স্বেচ্ছাকৃত। আমাকে তার করা হলো, তিনি মৃত্যুশয্যায়, আমাকে দেখতে চান। বম্বে থেকে ছুটতে হলো বড়োদায়। গিয়ে দেখি সকলে চোখ মুছছে। ডাক্তার নাকি জবাব দিয়ে গেছে। মা'র ঘরে যেতেই মা ইশারায় কাছে ডাকলেন। কাছে ছিল একটি অচেনা মেয়ে। তার একখানি হাতের সঙ্গে আমার একখানি হাত একত্র করলেন। তারপর কেবল কাঁদতে থাকলেন। আমার বোন সে ঘরে ঢুকে আমার কানে কানে বলল, মা'কে যদি বাঁচাতে চাও তা হলে বলো, আমি রাজি। আমি বুঝতে পারলুম না কিসে রাজি। যন্ত্রচালিতের মতো বললুম, আমি রাজি। ওদিকে শাঁখ বেজে উঠল। তখন আমার খেয়াল হলো যে আমি বিয়েতে রাজি। একবার রাজি হয়ে তারপর আর পিছিয়ে যাওয়া চলে না। মা সে যাত্রা বেঁচে গেলেন। আমি বিয়ে করলুম।"

আমি মন দিয়ে শুনছিলুম। বললুম "তার পরে?"

"তার পরে? তারপরে যা হয়ে থাকে। প্রথম কয়েক মাস কাটল উৎসবে, আনন্দে। মেয়েটি সুন্দরী, সুশীলা। আমাকে সুখী করতে তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা। কিন্তু শিক্ষিতা নন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে একজন ইনটেলেকচুয়াল কী করে তৃপ্তি পাবে! আমি যে কে, আমার কী যে কাজ, তাঁকে বোঝানো বৃথা। আমরা দু'জনে দুই জগতের লোক।

একসঙ্গে বাস করি, কিন্তু কেউ কাউকে চিনিনে। যা হোক, দিনগুলো মন্দ কাটছিল না। মোটের উপর আমরা সুখী দম্পতিই ছিলুম। তবে আমি যা উপার্জন করতুম তাতে আমাদের কুলোত না। স্ত্রীর সম্পত্তিতে হাত দিতে আমার ঘৃণা বোধ হতো। সেইজন্যে এক মহারাজার কাছ থেকে যখন প্রস্তাব এলো তাঁর কুমারদের গৃহশিক্ষক হবার, আমি সম্মতি দিলুম। বম্বে ছাড়তে হলো না। বম্বেতে মহারাজার প্রাসাদ ছিল। সেইখানে থেকে তাঁরা পড়াশুনা করতেন। পড়াশুনা অবশ্য নামমাত্র। খেলাধূলা আমোদপ্রমোদ সহবৎ ও সামাজিকতা নিয়ে তারা মশগুল। আমি আমার নিজের কাজের জন্যে যথেষ্ট সময় পেতুম। কিন্তু রাজ-পরিবারের সংস্পর্শে এসে আমার স্ত্রী হয়ে উঠলেন সোসাইটি উওম্যান। অবসর সময়ে দর্শনচর্চা করব কি, খোকাখুকুকে সামলাতে হতো। চাকরদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতুম না। তারপর খরচ দিন দিন বাড়তে লাগল। অনুযোগ করলে তিনি বলতেন, আমার টাকায় আমি বিবিয়ানা করি। তোমার টাকায় করিনে। এর উত্তরে আমি বলতুম, তাই যদি করবে তবে আমাকে বিয়ে করার দরকার কী ছিল? তখন তিনি প্রত্যুত্তর দিতেন, মেয়েরা বিয়ে করে কেন? এর কোনো জবাব মনে আসত না। আপনি বলতে পারেন, মেয়েরা বিয়ে করে কেন?"

আমি থতমত খেয়ে বললুম, "এমনি।"

"উঁহু। অমন করে এড়িয়ে গেলে চলবে না। যতই চিন্তা করবেন ততই গলদ্‌ঘর্ম হবেন। বহু মনীষী এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। কেউ কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। নাচার হয়ে মেয়েদের গাল পেড়েছেন। তাদের অপরাধ তারা কামিনী। যেন পুরুষরা

কামী নয়। কাঞ্চনকে জুড়ে দিয়েছেন কামিনীর সঙ্গে। যেন একের সঙ্গে অপরের হরিহর সম্পর্ক। স্ত্রী যদিও আমার টাকা খরচ করতেন না তবু আমার আত্মসম্মানে বাধত। আমি আপত্তি করলে তিনি বলতেন, তুমি যখন অক্স্‌ফোর্ডে ছিলে তখন বাপের টাকা দু'হাতে খরচ করতে। মনে করো আমার বাবা আমাকে অক্স্‌ফোর্ডে না দিয়ে বিয়ে দিয়েছেন। এমন কী অন্যায় করছি আমি, যা তুমি করোনি! কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। আমিও তো এক কালে সামাজিকতার চূড়ান্ত করেছি। আমার বয়সে আমি যা করেছি তাঁর বয়সে তিনি তাই করছেন অথচ আমার একটুও ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে এর একটা জবাব আছে, যদিও মাথায় আসছে না কী জবাব। প্রাচীনেরা হলে এক কথায় শেষ করে দিতেন। ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। আমরা আধুনিকেরা তা তো পারিনে। থীসিস ফাঁদি। আমার দার্শনিক চিন্তা পথভ্রষ্ট হচ্ছিল বলে আমার মনে ক্ষোভ জমছিল।"

৪

তাঁর কণ্ঠস্বর বিকৃত হতে হতে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। আমি বললুম, "একটু জল খাবেন?"

তিনি বললেন, "জল নয়, দুধ কিংবা কোকো।"

কোকোর জন্যে বলে পাঠালুম।

"কুমারদের অক্স্‌ফোর্ডে দেবার কথাবার্তা চলছিল। মহারাজার ইচ্ছা আমিও তাঁদের সঙ্গে যাই। অভিভাবক হই। আমারও ইচ্ছা করছিল আরেক বার অক্স্‌ফোর্ডে গিয়ে দার্শনিকদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে। কে কী ভাবছেন কে কী লিখছেন সে সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে।

সেখান থেকে কন্টিনেণ্ট ঘুরে আসার অভিলাষ ছিল। কিন্তু স্ত্রীপুত্র-কন্যাকে পিছনে ফেলে যেতে কষ্ট হচ্ছিল। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া তো অর্থসামর্থ্যে কুলোয় না। তা হলে স্ত্রীর টাকা নিতে হয়। তাতে আমার আন্তরিক আপত্তি।"

কোকো এলো। তিনি আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, "এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলুম। বললুম, আমার কাজ আছে বলে আমি বিদেশে যাচ্ছি। আমি ফূর্তি করতে যাচ্ছিনে। তোমার কাজ থাকলে তুমিও যেতে। কিন্তু তুমি তো বাড়ীর কাজ করবে না, ছেলেমেয়েকে দেখবে না। আমারই ঘাড়ে চাপাবে। মাটি হবে আমার কাজ। তা হলে বিদেশে যাওয়া বৃথা। তিনি এর একটা কড়া উত্তর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুমি যে ওখানে ব্রহ্মচারীর মতো থাকবে এ আমি বিশ্বাস করিনে। কেন তা হলে আমাকে দগ্ধে মারবে! আমি তাঁকে যতই বলি, যতই বোঝাই, তিনি ততই উন্মত্ত হন। কিন্তু কী করি, আমার উপায় ছিল না সপরিবারে বিদেশযাত্রার। গিয়ে দেখলুম যা ভেবেছিলুম তাই। দার্শনিক চিন্তা আমার অবর্ত্তমানে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমি সেই পরিমাণে পিছিয়ে পড়েছি। দারুণ খাটতে হবে। খাটতে লাগলুমও। মাসের পর মাস কেটে গেল অগ্রসরদের পশ্চাদ্ধাবন করতে। মেয়েরা এর কী বুঝবে! কেবল চিঠি লিখবে, চলে এসো, খোকার জ্বর। চলে এসো, খুকুর আমাশয়। চলে এসো, আমার মাথা খারাপ। হোল্ট্‌বি আমার সতীর্থ। এই ক'বৎসরে সে যা নাম করেছে তা আশ্চর্য হবার মতো। সে যেন হলডেন আর আমি যেন পি কে রায়। আমাকে অনুকম্পার চক্ষে দেখে। কুস্তিতে হেরে গেছি আমি, জিতেছে সে, তাই আমার

প্রতি অনুকম্পা। পুরুষের এ দুঃখ মেয়েরা বুঝবে কী! আমি একটা পেপার লিখেছিলুম। হোল্‌ট্‌বি তার উপর চোখ বুলিয়ে বল্‌ল, তুমি একটি রিপ ভ্যান উইঙ্কল। এসব থিয়োরি কবে উল্টে গেছে।”

বড়োদেকর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “জীবনটা ব্যর্থ গেল। কোনো কাজেই লাগল না। হোল্‌টবি গরিবের ছেলে। বিয়ে করেনি। অক্‌স্‌ফোর্ডের মাটি কামড়ে পড়ে আছে শুধু জ্ঞানার্জনের জন্য, জ্ঞান-ভাণ্ডারে নিজের বলতে কিছু দান করবার জন্য। আর আমি! বাপের কথায় বাড়ি ফিরি, মায়ের কথায় বিয়ে করি, স্ত্রীর মুখ চেয়ে মহারাজার গৃহশিক্ষক হই। হোল্‌টবি এক দিন আলেকজাণ্ডারের কিংবা বারট্রাণ্ড রাসেলের সমকক্ষ হবে। আর আমি হব পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা। এ কথা ভাবতেই জীবন বিস্বাদ হয়ে ওঠে। দেশ থেকে যখন তার আসে খোকার টাইফয়েড, দেখতে চাও তো আকাশপথে উড়ে এসো, পাথেয় পাঠাচ্ছি, তখন অবিশ্বাস করি। মায়ের অসুখের মতো এটাও একটা অভিনয়। আমাকে এরা কেউ বিখ্যাত দার্শনিক হতে দেবে না। দেশে ফিরিয়ে নিয়ে বলবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ার খালি হচ্ছে। তদ্বির করো। আমি এ ফাঁদে পা দেব না। যত দিন পারি অক্‌স্‌ফোর্ডে পড়ে থাকব। ট্রাঙ্ক কল করে খবর নিলুম। মনটা উতলা হলো। জোর করে মনকে বুঝ দিলুম, কার্ল মার্কসেরও ছেলে মারা গেছল, তিনি তা বলে পথভ্রষ্ট হননি। দেশে ফিরে গেলেই যে সে বাঁচবে তার নিশ্চয়তা কোথায়! একবার ফিরে গেলে কি ফের আসতে পাব! না, যাব না।”

সন্ন্যাসীর চোখে জল দেখা দিয়েছিল। গাঢ় কণ্ঠে বললেন, “মারা গেল। যাবার আগে তার বিশ্বাস ছিল তার বাবা মেঘের উপর দিয়ে উড়ে আসবে। সে আকাশের তলায় শুয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকাত

আর ক্ষণে ক্ষণে বলত, কই, বাবা কোথায়! বাবা বাবা করেই মারা গেল ছেলেটি। খবরটা যখন পেলুম তখন সে যে কী দুঃখ তা আমি কোনোদিন কাউকে বোঝাতে পারব না। দুঃখের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল অপরাধবোধ। মনে হচ্ছিল মরা উচিত ছিল আমারই, তার নয়। বেঁচে থেকে আমি কার কী উপকার করব! সে যদি বেঁচে থাকত জগৎকে দিয়ে যেত কত কী সম্পদ! দর্শনশাস্ত্রে আমি শান্তি বা সান্ত্বনা খুঁজে পেলুম না। মৃত্যুরহস্য ভেদ করার ক্ষমতা কোনো দার্শনিকের নেই। চিন্তা এখানে অক্ষম। বুদ্ধি এখানে পরাস্ত। দর্শনের উপর আমার বিতৃষ্ণা ধরে গেল। যশের জন্যে দর্শনচর্চা আমার কাছে ছেলেখেলা মনে হলো। সঙ্কটের আলোয় নিজেকে চিনলুম। আমি হোল্‌টুবির মতো জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের উপাসক নই। আমি উচ্চাভিলাষী। কিন্তু কী মূল্যে?"

তিনি এবার জল চাইলেন। পানীয় জল। তাঁর গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল।

বললেন, "মহারাজার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে এলুম। ফিরে এসে দেখলুম স্ত্রীকে নিয়ে গেছে পাগলা গারদে। মেয়েকে কোলে নিতে চাই, শাশুড়ী নিতে দিলেন না। বললেন, তোমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই। তুমিও যা, একজন রাস্তার লোকও তাই। ও মেয়ে পরের কোলে যাবে না। মেয়েটাকে ওরা কী যে শিখিয়েছিল, সেও একবার বাবা বলে ডাকল না। মুখ ফিরিয়ে নিল। অথচ এই মেয়েই ছিল আমার নয়নের মণি! একে কোলে নিয়ে আমি দিনের পর দিন পায়চারি করে কাটিয়েছি। রাত্রে এ মেয়ে কাঁদত। তখন এর খাটের কাছে গিয়ে আমি এর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিতুম। এর মা

বিছানা থেকে উঠতেন না। তাঁর ঘুম সহজে ভাঙত না। ভাঙালে তিনি আমাকেই তার কাছে পাঠাতেন। সেই মেয়ে আমাকে চিনতে পারল কিনা সন্দেহ। মেয়ের অকৃতজ্ঞতায় বিমর্ষ হয়ে আমি রাজা লীয়ারের মতো গৃহত্যাগ করলুম। নানা স্থানে বেড়ালুম। কত সাধকের সঙ্গে আলাপ হলো। তার পরে একদিন পেয়ে গেলুম আমার গুরুকে। তিনি আমাকে সংসারে থাকতেই উপদেশ দিয়েছিলেন। স্ত্রীর সেবা করতে, মেয়ের ভার নিতে। আমি তাঁর কথামতো চেষ্টা করেছিলুম কিছু কাল। বৃথা চেষ্টা। যে পাগল নয় তার পাগলামি সারানো যায় না। সে সব কথা এত ইন্টিমেণ্ট যে বলবার মতো নয়। এমন কি, গুরুর কাছেও নয়। তিনি অনুমানে বুঝলেন। তার পরে দীক্ষা দিলেন। তার পর থেকে এগারো বছর অতীত হয়েছে। সন্ন্যাসীকে পরিত্যক্ত পরিবারের সংবাদ নিতে নেই। আমিও নিইনি। তারাও দেয়নি। বেঁচে আছে কি না জানিনে। থাকলে কোথায় আছে, পাগলা গারদে না বাপের বাড়ীতে, তাও জানিনে। আমার মা-বাবা আগেই মারা গেছলেন। কাজেই শ্বশুরবাড়ীতে থাকা সম্ভবপর নয়। মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে। এই আশ্বিনে আঠারোয় পড়বে। আমাদের সমাজে বিয়ের বয়স ক্রমে বাড়ছে। আশা করি সে যতদিন পারে অনূঢ়া থাকবে। ভাবতে কষ্ট হয় যে সে আমার মতো একটা অপাত্রের হাতে পড়বে। না, তার চেয়ে চিরকুমারী হওয়া ভালো।”

এর পরে তিনি ভোঁ হয়ে আবোল তাবোল বকতে আরম্ভ করলেন। তাঁকে ঘাঁটাতে সাহসী হলুম না। রাত হয়েছিল। তাঁর ট্রেন বারোটায়। তার আগে যদি ঘুমিয়ে নিতে পারেন তো মন্দ হয় না।

এমন সময় ডাক্তারের গলা শোনা গেল বাইরে। তিনি এসেছিলেন

মোটর নিয়ে সাধুজীকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে। স্টেশনের ওয়েটিং রুমে তাঁর বিছানা পাতা হবে। তিনি সেখানে বিশ্রাম করবেন। ধানবাদের টিকিট কাটা হয়েছে। সীট পাওয়া গেছে ওখানকার হাসপাতালে।

আবার তাঁকে ধরাধরি করে গাড়িতে তুলে দিতে হলো। গাড়িতে উঠেই বললেন, "আমার কল্কে? আমার কল্কে কে নিল?" কল্কের জন্যে ছুটতে হলো বারান্দায়। কল্কে পেয়ে তিনি স্বর্গ হাতে পেলেন। যত্ন করে আলখাল্লার পকেটে পুরলেন। তার পর আমার দিকে চেয়ে বিখ্যাত বিদ্বান বড়োদেকর বললেন, "ব্যোম ব্যোম। বাবু সাহেব, ব্যোম ব্যোম।"

গাড়ি ছেড়ে দিল।

(১৯৫০)

পথ গেছে হারিয়ে

চন্দ্রকিরণের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। আলাপ হলো হঠাৎ এক দিন এক সাহিত্যের আসরে। বলল, "আমি তো সাহিত্যিক নই। কী বলে নিজের পরিচয় দেব?"

আমি তাকে অভয় দিয়ে বললুম, "আমিও সাহিত্যিক নাকি? জীবনের ডাক শুনলে যে কোনো দিন সাহিত্যের পাট তুলে দিতে পারি।"

"তা হলে," চন্দ্রকিরণ আশ্বস্ত হয়ে বলল, "আপনার সঙ্গে আমার বনবে ভালো। সত্যি বলতে কি আপনাকেই আমি খুঁজছিলুম।"

আসর থেকে লুকিয়ে এক সময় বেরিয়ে পড়লুম আমরা দু'জনে। ছেলেবেলায় যেমন ক্লাস থেকে পালিয়েছি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চা খেয়ে, চানাচুর চিবোতে চিবোতে আমরা পরস্পরের যে পরিচয় দিলুম ও নিলুম তা নিত্যকালের কিশোরবয়সীর। অথচ তখন আমাদের বয়স ত্রিশের কোটায়। কলকাতায় কেউ কাউকে চেনে না বলেই রক্ষা। মফঃস্বল হলে ঢি ঢি পড়ে যেত।

"এইজন্যেই," আমি বললুম, "কলকাতা আমার এত ভালো লাগে। এখানে আমি নামহীন পরিচয়হীন অজ্ঞাত অখ্যাত মুসাফির। আমি anonymous।"

"সেইখানেই," চন্দ্রকিরণ বললেন, "আমার দুঃখ। কলকাতা শহরে আমি আর anonymous নই। এবার বেরিয়ে পড়তে চাই আত্ম-পরিচয় গোপন করে ছদ্মনামে ও ছদ্মবেশে কলকাতার বাইরে, ভারতের বাইরে।"

"কোনখানে ?"

"আপাতত ইউরোপে।"

"কেন, আগে কখনো যাননি ?"

"কত বার গেছি পক্ষিরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে।" তার পর করুণ হেসে বলল, "মায়ের একমাত্র পুত্র। স্ত্রীর অঞ্চলের নিধি।"

আমি দুঃখিত হয়ে বললুম, "তা হলে আপনার মনে একটা আফসোস রয়ে গেছে, বলুন।"

"শুধু কি আফসোস ? আকুলতাও। 'ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি। মোর ডানা নাই, আমি আছি এক ঠাঁই, সে কথা যে যাই পাসরি।' আর ভালো লাগে না এমন করে বেঁচে থাকতে। বেঁচে থাকা—নয় সে তো বাঁচা। আমি বাঁচতে চাই।"

আমাদের কথাবার্তা ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর পর্যায় ধরে চলল। আমরা ভুলে গেলুম যে আমাদের আলাপ মাত্র একদিনের।

চন্দ্রকিরণরা কলকাতার বনেদী ভদ্রলোক। পুরুষানুক্রমে সলিসিটর। বিত্তের অভাব কাকে বলে জানে না। বিত্তের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিদ্যা। বিদ্যার সঙ্গে রূপ। চন্দ্রকিরণ যেমন বিদ্বান তার স্ত্রী তেমনি রূপবতী। বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। কিন্তু সন্তান হয়নি। স্ত্রী এরই মধ্যে ধর্ম-কর্মে মন দিয়েছেন। চন্দ্রকিরণ কোনো দিকে মন দিতে পারছে না। মন লাগছে না। কোথাও চলে যেতে চায় কিছুদিনের জন্যে। তারও উপায় নেই। কড়া পাহারা, চোখের জল, প্রায়োপবেশন।

দুঃখের উপর দুঃখ, কারো সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারে না। সর্বদা একটা ব্যবধান বজায় রাখতে হয়। নইলে বংশের মানহানি। প্রোফেসনের মর্যাদাহানি। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক হয়ে জন্মেছে বলে তাকে

সারাজীবন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে হবে। পাইস হোটেলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পচা মাছের ঝোল মাছিদের সঙ্গে ভাগ করে খেতে পাবে না। মেসের কেরানীদের সঙ্গে চৌবাচ্চার জলে আতুল গায়ে স্নান করতে পাবে না। বস্তির লোকের সঙ্গে রাত জেগে পাড়ার লোককে জাগিয়ে পাখোয়াজ বাজিয়ে গান জুড়তে পাবে না। সিগারেট খেতে আপত্তি নেই, কিন্তু বিড়ি খেলে জাত যাবে। মদ খেতে পারো, কিন্তু খবরদার তাড়ি কিংবা ধেনো খেয়ো না। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কত কী করতে সাধ যায়, কিন্তু জুতো বুরুষ করতে বসলে বেয়ারা ছুটে আসে—হাঁ, হাঁ, কী করছেন! এ কি আপনার কাজ! ঝাঁটা হাতে করলে জমাদার তেড়ে আসে—হাঁ, হাঁ, এ কী করছেন! এ ছোটলোকের কাজ। ইচ্ছা করে রিকৃশা টানতে। রিকৃশাওয়ালাকে বকশিষ দিয়ে টেনেও ছিল একদিন। অমনি পাড়াশুদ্ধ লোক ভেঙে পড়ল দৃশ্য দেখতে। কোচমানকে বলে কয়ে ফিটন চালাতে গিয়ে দেখে কে একটা ভিখিরী চাপা পড়ে আছে। অমন করে সবাই মিলে যদি বাধা দেয় তা হলে চন্দ্রকিরণের কোনো কাজই করা হয় না, এক অর্থোপার্জন ছাড়া।

আর অর্থোপার্জনে কি সুখ আছে! পরস্ব অপহরণের যত রকম পদ্ধতি আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো বণিকবৃত্তি। বণিকের ধন সলিসিটরের ঘরে আসে, যেমন চোরের ধন বাটপাড়ের খপ্পরে। চন্দ্রকিরণের ভালো লাগে না চুরি কিংবা বাটপাড়ি। ঘেন্না ধরে যায় নিজের উপর, পরের উপরে। কিন্তু কাকে বলবে এ কথা! বাপ কাকা মামা মেসো সকলেরই ঐ পেশা, ঐ বৃত্তি। ওঁরা হয় বণিক নয় সলিসিটর। বাইরের লোকের সঙ্গে মেশা বারণ। যদি বা মেশে তবু প্রাণ খুলে কথা

বলতে পারে না। ব্যবধান বজায় রাখতে প্রাণান্ত। ক্লাবে যায়, সেখানে যাদের সঙ্গে টেনিস খেলে বা ককটেল খায় তারাও তার নিজের শ্রেণীর লোক। তারা এক মিনিটও ভাবে না, কেমন করে টাকাটা আসছে, অমন করে আসাটা কি ভালো, সমাজের কি ওতে মঙ্গল হচ্ছে, না অমঙ্গলের বারুদ জমছে!

চন্দ্রকিরণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হায়! একবার যদি বেরিয়ে পড়তে পারতুম!"

"তা হলে?" আমি কৌতূহল প্রকাশ করলুম।

"তা হলে? তা হলে মরা গাঙে বান ডাকত। সমুদ্রের হাওয়া আমাকে দু'দিনেই চাঙ্গা করে তুলত। আহ্! কী যে ভালো লাগত জাহাজে চড়ে দুলতে!"

আমি হেসে বললুম, "তারপরে যখন সী সিক্‌নেস হতো তখন কিন্তু ভালো লাগত না।"

"লাগত, লাগত। সব কিছু ভালো লাগত। সী সিক্‌নেস। পাঁচ সাত দিন বিছানায় শুয়ে থাকা। তারপরে যেন নতুন জীবন ফিরে পাওয়া। নতুন চোখে দেখা। নতুন পায়ে হাঁটা। চলি চলি পা পা।"

আমি শুনতে লাগলুম। বলতে লাগল চন্দ্রকিরণ, "ইংলণ্ডে পৌঁছে আমি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতুম। কেউ আমার খোঁজ পেত না, বাড়ীতে জানাত না। মজুরদের সঙ্গে রাস্তা মেরামত করতুম আর তেষ্টা পেলে Pub-এ ঢুকে সস্তা বীয়ার খেতুম। আর খিদে পেলে খেতুম কুচো মাছ আর আলু ভাজা। থাকতুম কোনো বস্তিতে।"

এই আরব্য উপন্যাসের গল্প শুনতে মন্দ লাগছিল না। শুনছিলুম

আর মিলিয়ে দেখছিলুম চন্দ্রকিরণের প্রকৃতির সঙ্গে এর কোনো সঙ্গতি আছে কি না।

"তবে মাসের মধ্যে দু'তিন দিন সাজ বদল করে Ritzএ গিয়ে উঠতুম। নইলে আবার সেই খাড়া বড়ি থোড় খেতে খেতে অরুচি ধরে যেত। আবার সেই একঘেয়ে জীবন, যার জন্যে দেশ ছেড়ে পালানো।"

"তা বলে এক লম্ফে slum থেকে Ritz! মাঝখানের ধাপগুলো কী দোষ করল!" আমি জানতে আগ্রহ বোধ করছিলুম।

"না, না। আর ও-সব ভালো লাগত না। দেশে থাকতে ও-সব যথেষ্ট হয়েছে। সত্যিকারের নতুন কিছু চাই বলেই তো বিদেশে বিভূঁয়ে ঘুরে বেড়ানো।"

এর পরে চন্দ্রকিরণ পাড়ল প্যারিসের কথা। সেখানে সে শিল্পীদের সঙ্গে জুটে বোহেমিয়ান হবে। কাফে আর বুলভার্দ, স্টুডিও আর সালোঁ। সাজপোশাক বহুরূপীর মতো। যে দেখবে সে বলবে, হাঁ, আর্টিস্ট বটে। সার্কাসের বাইরে এমনটি আর দেখা যায় না। ছাত ফুঁড়ে জল পড়ছে, ছাতা মাথায় দিয়ে ছবি আঁকা হচ্ছে। এই তো জীবন!

কিন্তু কিছুদিন বাদে এখানেও সেই থোড় বড়ি খাড়া। সেইজন্যে মুখ বদলানোর জন্যে যেতে হয় দক্ষিণ ফ্রান্সে। মন্তে কার্লো, নীস, মোনাকো। কাসিনোতে জুয়োখেলার ধূম। হারজিৎ যা থাকে কপালে। একেই বলে জীবন।

সেদিন কথা বলতে বলতে কখন এক সময় সে আমাকে ও আমি তাকে "তুমি" বলতে শুরু করেছিলুম। বললুম, "চন্দ্রকিরণ, এক বার বেরিয়ে না পড়লে তোমার দিবাস্বপ্ন ভাঙবে না। বেরিয়ে পড়লে দেখবে স্বপ্নে বাস্তবে অনেক তফাৎ। তুমি বেরিয়ে পড়ো।"

"বেরিয়ে পড়তে দিচ্ছে কে! বুদ্ধদেবের যশোধরা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে তিনি বেরিয়ে পড়তে পেরেছিলেন। আমার যশোধরা রাত ভর এক চোখে ঘুমোয়। তার মানে পাহারা দেয়।" চন্দ্রকিরণ ক্ষোভের সঙ্গে বলল।

"যশোধরাকেও নিয়ে যাও না কেন? আজকাল কত লোক সস্ত্রীক বিলেত যায়। তোমার তো অর্থের অভাব নেই!"

"ওকে নিয়ে যাবার কথা বলছ! তা হলে সব মাটি হবে। আমি কোনো মতে আত্মগোপন করতে পারি। কিন্তু ওকে গোপন করব কোথায়! আমার সঙ্গে একটা স্যুটকেস থাকলে যথেষ্ট। ওর সঙ্গে লটবহর থাকবে অজস্র। আমার চাকরের দরকার নেই। ওর ঝি চাকর না থাকলে চলে না। ভাবতেই পারা যায় না যে ওর সামনে আমি রাস্তা খুঁড়ছি, Pub-এ দাঁড়িয়ে বীয়ার খাচ্ছি। না, না, ও যদি যেতে চায় তা হলে আমি যেতে চাইনে।"

চন্দ্রকিরণ ওর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না। ওর স্ত্রীও ওকে একলা যেতে দেবে না। এ সমস্যার সমাধান আমার জানা ছিল না। আমি চুপ করলুম।

"স্ত্রীর বোঝা বহন করার চেয়ে গন্ধমাদন বহন করা সহজ। কলকাতা থেকে দার্জিলিং যেতেই হিমসিম খাই। বিলেত যেতে হলে মারা যাব।" চন্দ্রকিরণ আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

তার পর সে লক্ষ্য করল যে আমি মৌন রয়েছি। বলল, "এখন বুঝতে পারলে তো কেন তোমাকে খুঁজছিলুম। এবার পথ নির্দেশ করো।"

পথ কোথায় যে পথ নির্দেশ করব। বললুম, "দাঁড়াও, ভাবি।" কিন্তু

ভেবে কোনো কুল কিনারা পেলুম না। পুনর্দর্শনের দিন ফেললুম। কিন্তু তার আগেই আমাকে কলকাতা ছাড়তে হলো।

২

এই ঘটনার বছর কয়েক পরে আবার তার সঙ্গে দেখা। মহাযুদ্ধের মাঝখানে। তার আমার দু'জনেরই কেশে পাক ধরেছে। তারই বেশী।

সাহিত্যের আসরে নয়, লঙ্গরখানায়। চন্দ্রকিরণ পুণ্যসঞ্চয় করছিল মন্বন্তরের সময় হতভাগ্যদের তরলান্ন খাইয়ে। পিইয়ে বললে আরো ঠিক হতো। আমি কলকাতা এসেছি শুনে লোক পাঠিয়ে দিয়ে ধরে নিয়ে গেল এক লাইন সুপারিশ সংগ্রহ করতে। যাতে যথেষ্ট চাল পাওয়া যায়।

"খুব ফাঁকি দিলে সেবার।" চন্দ্রকিরণ বলল।

"যাক, খবর কী তোমার? সব ভালো তো?" আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

"বেঁচে আছি তা তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু বেঁচে থাকা—নয় সে তো বাঁচা।" সে পূর্বের মতো আক্ষেপ জানাল।

কঙ্কালসার নরনারীর সঙ্গে তার ঘৃতপুষ্ট বপুখানির তুলনা করে মনে হলো না যে সে জীবন্মৃত। বরং এই কয় বছরে আরো মেদ বৃদ্ধি হয়েছে।

"কেন, বাঁচার কমতি কোথায়?" আমি প্রশ্ন করলুম।

"সেই একঘেয়ে জীবনযাত্রা।" সে ঠোঁট উলটিয়ে বলল। তেমনি বিরস উদাস স্বরে। "আর ভালো লাগে না তার জের টানতে। এবার বেরিয়ে পড়তে চাই এক বস্ত্রে একখানা কম্বল সম্বল করে। সাধুদের সঙ্গে মিলে কেদার বদরী যাব। সেখান থেকে কৈলাস মানস সরোবর।"

"বৌদি যেতে দেবেন তো?"

"বৌদি যেতে দেবেন ? ক্ষেপেছ ?"

"তা হলে কেমন করে সম্ভব ?"

"কেমন করে সম্ভব !" চন্দ্রকিরণ প্রতিধ্বনি করল। "আমিও সেই কথা বলি।"

"এক কাজ করলে হয় না ? বৌদিকেও নিয়ে গেলে দোষ কী ?"

"তা হলে গিয়ে কোনো সুখ নেই। তা হলে কি আমি ধুনী জালিয়ে ওঁ ওঁ করতে পারব !" চন্দ্রকিরণ তার মনের কথা খুলে বলল।

"তোমার হঠাৎ এ খেয়াল চাপল কেন ?" আমি জানতে চাইলুম।

"খেয়াল নয়। জীবনের দ্বারে দ্বারে করাঘাত হানা।" চন্দ্রকিরণ রহস্যমগ্ন হয়ে বলল, "কে জানে কখন কোন দরজা খুলে যাবে! প্রবেশপথ পেয়ে যাব।"

আমি বললুম, "ভালো। কিন্তু বৌদিকেও সঙ্গে নিয়ে যেয়ো।"

চন্দ্রকিরণ আমার দুই হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, "তুমি কি মনে করো আমি ও কথা ভাবিনি ? ভেবে দেখেছি তা হবার নয়। ও যদি আমার সঙ্গে যায় ওকে গোপন করতে পারব না। কাজেই আত্মগোপন করতে পারব না। আর তাই যদি না পারলুম তবে আর দশজনের মতো তীর্থযাত্রা করলেই হয়। জীবনের দ্বারে দ্বারে করাঘাত হানা দুরাশা, যদি আত্মগোপন করতে না পারি।"

কথাটা বুঝতে আমার অনেকক্ষণ লাগল। জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা, আত্মগোপন করার জন্যে তোমার এত ব্যগ্রতা কেন ? তুমি কি খুনটুন করেছ, না আর কোনো শোচনীয় অপরাধ ?"

"অপরাধ !" চন্দ্রকিরণ কাতর কণ্ঠে বলল, "অপরাধ কি একটি না এক বার! এই যে এতগুলো মহাপ্রাণী খেতে না পেয়ে কলকাতার

ফুটপাথে ফুটপাথে পড়ে মারা যাচ্ছে এরা তো সাধারণ ভিখিরী নয়। এরা খেটে খাওয়া মানুষ। এদের মুখের গ্রাস আমরা বেশী দাম দিয়ে কিনে এনেছি। আমরা মানে আমার মেজ মামা ও তাঁর কোম্পানি। ঘরের উপর বিধাতার অভিশাপ পড়বে, সেই ভয়ে আমি লঙ্গরখানা খুলেছি। আমার মামাতো ভাই প্রদ্যুম্ন তো দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। কেউ বলতে পারে না কী তার অসুখ। নিজে বলতে চায় না। বোবার মতো বসে থাকে। হাবাগোবার মতো। দেখে কষ্ট হয়।"

লক্ষ করলুম চন্দ্রকিরণের চোখ ছলছল করছে। প্রশ্ন করলুম, "আর তোমার মামা?"

"মামা দিনের বেলা অর্থ অর্জন করেন, রাতের বেলা ধর্ম অর্জন। রোজ কালীঘাটে যান। ফিরতে দশটা এগারোটা বাজে। মামী বলেন, কার জন্যে এত টাকা করছ? ভোগ করবে কে? ছেলেটা তো চিকিৎসার বাইরে।"

আমি এ প্রসঙ্গ আর বাড়তে দিতে রাজি ছিলুম না। মোড় ঘুরিয়ে দিলুম। বললুম, "তা হলে তুমি আত্মগোপন করে সাধুদের সঙ্গে সাধু সাজতে চাও। বেশ, বেশ।"

"ভেক নেব না। সংসার ত্যাগ করব না।" চন্দ্রকিরণ বুঝিয়ে বলল, "কিন্তু কিছু কালের জন্যে বাঁচব। এখন এরা আমাকে বাঁচতে দিলে হয়!"

এরা মানে জীবনসঙ্গিনী। গৌরবে বহুবচন। জীবনসঙ্গিনী যিনি, তিনি তাকে বাঁচতে দিলে হয়! শুনে আমি হাসব না কাঁদব! রসিকতা করবার মতো বিষয় বটে। কিন্তু স্থান কাল পাত্র রসিকতার অনুকূল নয়। তা বলে চোখের জল ফেলব কেন?

বললুম, "আচ্ছা, বৌদির অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। জগৎটা যা ভেবেছ তা নয়। দু'দিন বাদে আপনি ফিরে আসবে। মানস সরোবর পর্যন্ত যেতে হবে না।"

"মানস সরোবর দূরের কথা, মোগলসরাই পর্যন্ত গিয়ে ফিরতি ট্রেন ধরব, তার জো নেই। হয় ওকে সঙ্গে নিতে হবে, নয় নিতে হবে এক পাল চাকরবাকর। একলা যাওয়া চলবে না। আর একলাই যদি না গেলুম তবে গিয়ে সুখ কোথায়!" চন্দ্রকিরণ তার প্রাণের ব্যথা জানাল।

বেচারা! তার জন্যে কীই বা করতে পারি! সহানুভূতিসূচক দু'চার কথা বলে বিদায় চাইলুম। সে বলল, "পথ নির্দেশ করলে না যে?"

"ভেবে দেখি।" এই বলে পাশ কাটালুম।

৩

চন্দ্রকিরণের সঙ্গে সেদিন দেখা হলো পার্ক স্ট্রীটের একটা বিলিতী বইয়ের দোকানে। এক রাশ ভ্রমণকাহিনী কিনেছে। আরো কয়েক-খানার পাতা ওলটাচ্ছে। বয়স পঁয়তাল্লিশ কি ছেচল্লিশ, কিন্তু দেখলে মনে হয় পঞ্চান্ন কি ছাপ্পান্ন। মাথায় চুল যে ক'গাছি আছে কানের আড়ালে আত্মগোপন করেছে। ভুঁড়ি কিন্তু আত্ম-গোপনের আশা ছেড়ে দিয়েছে। চেহারা, চালচলন ও পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে মালুম হয় একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বটে। একজন বর্ধিষ্ণু নাগরিক।

কুশলবিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা করলুম, "এখনো ও বাতিক গেল না!"

"বাতিক!" সে বিস্মিত হয়ে বলল, "বাতিক কাকে বলছ! ও যে আমার প্রাণ। ও যদি যেত প্রাণ থাকত ভাবছ!"

জানতে চাইলুম ইতিমধ্যে কোথাও বেড়াতে গেছে কি না।

বলল, "হাঁ, এইবার বেরিয়ে পড়ব। আর ভালো লাগে না এমন করে বেঁচে থাকতে। খাবার সুখ ছিল, তাও ঘুচে গেল কণ্ট্রোলের জ্বালায়। শুনছি মিউনিসিপাল রেট বাড়বে। বাড়ুক, আমি তত দিনে কালাপানি পার!"

"এবার কোন দেশে চললে?"

"দেশ!" সে সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, "না, না, দেশ দেখে সুখ নেই। সব দেশেই কণ্ট্রোল। সব দেশেই ট্যাক্স্। এবার যাচ্ছি কার্গো বোটে, বন্দর থেকে বন্দরে। কলকাতা থেকে আফ্রিকা ঘুরে একশো বছর আগে যেমন করে লণ্ডনে যেত তেমনি করে যাব লণ্ডনে, আমস্টারডামে, কোপেনহেগেনে, স্টকহলমে। সম্ভব হলে লেনিনগ্রাডে। তার পরে পিছু হটতে হটতে হামবুর্গ ব্রিমেন হয়ে নিউ ইয়র্ক। তার পর দক্ষিণ আমেরিকা পরিক্রমা করে সান ফ্রান্সিস্কো। সেখান থেকে টোকিও শাংহাই হংকং। অবশেষে সিঙ্গাপুর রেঙ্গুন চট্টগ্রাম হয়ে কলকাতা।"

আমি তারিফ করে বললুম, "চমৎকার!"

সে খুশি হয়ে আমার হাতে হাত রেখে বলল, "চমৎকার কি না তুমিই বলো। তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে চিনল না, কেউ আমাকে বুঝল না। যে শোনে সেই বলে, পাগল না ক্ষ্যাপা। বাড়িতে তো অনশন ধর্মঘট। এবার বলছে না যে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো। এবার বলছে, তোমাকেও যেতে দেব না। কী অন্যায় গ্যাখ দেখি। আমি এখন বুঝতে পেরেছি কোনখানে ওর দুর্বলতা। সেইজন্যে আমিও চাপ

দিচ্ছি। বলছি, চলো, একসঙ্গে বেরিয়ে পড়া যাক। তুমি আর আমি এক নৌকায়।"

আমি উপভোগ করছিলুম তার অবস্থাটা। বললুম, "সাবাশ!"

চন্দ্রকিরণ আমার হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে চলল ফ্লুরি'তে। কেক খেতে ও খাওয়াতে। বলল, "কতকটা প্যারিসের পাতিসেরির মতো নয় কি?"

তার মনে দুঃখ হবে বলে ঘুরিয়ে বললুম, "নয় তো কী!"

তার বিশ্বাস সে কলকাতায় বসে প্যারিসের স্বাদ পাচ্ছে। কেবল প্যারিসের কেন? এই তো অক্সফোর্ড বুকশপ থেকে বই কিনল। ভাগ্যিস্ আমাকে বলেনি, "কতকটা অক্সফোর্ডের মতো নয় কি?"

কেক খেতে খেতে চন্দ্রকিরণ প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। মন তার তখন ফ্লোরেন্সে কি রোমে। বলছিল, "গিয়েই বা কোন সুখ! সবই তো ভেঙে-চুরে দিয়েছে আমেরিকানরা।"

"না। সব ভেঙে-চুরে দেয়নি। অনেক কিছুই অক্ষত রয়েছে।" আমি আপত্তি করলুম।

তাতে উল্টো ফল হলো। চন্দ্রকিরণ বিমর্ষ হয়ে বলল, "কে জানে রাশিয়ানরা কোনদিন ভেঙে-চুরে দেবে! তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবে শুনছি। তার আগে যদি না দেখি তো এ জন্মে দেখা হলো না। প্রত্যেকটি দিন মূল্যবান। কিন্তু—" শেষ করতে পারল না। মুখ বন্ধ ছিল কেকে।

"চলো একটু স্ট্রাণ্ড ঘুরে আসি।" প্রস্তাব করল চন্দ্রকিরণ। স্ট্রাণ্ড এক্ষেত্রে কলকাতার স্ট্রাণ্ড রোড নয়, লণ্ডনের স্ট্রাণ্ড। আমি রাজি হলুম।

হাওড়া ব্রিজ থেকে শুরু করে আমরা গঙ্গার ধার ধরে মোটরে

ঘুরলুম। খিদিরপুর ডক পর্যন্ত। জাহাজের দিকেই আমাদের দু'জনের দৃষ্টি। রকমারি দেশের রকমারি নিশান উড়ছে। কোনটা কোন দেশের তাই নিয়ে চন্দ্রকিরণ উৎসাহের সঙ্গে পাণ্ডিত্য ফলাতে লাগল। গ্রীক লিপিতে, রুশ লিপিতে লেখা ছিল কয়েকটার নাম। চন্দ্রকিরণ অক্লেশে উদ্ধার করল।

মনে মনে এই সব জাহাজে চড়ে সে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এসেছে। মাসের মধ্যে দু'একদিন সে জাহাজগুলো দেখে যায়। এগুলো যেন চাঁদ সওদাগরের সপ্ত ডিঙা। বাঙালীর ছেলেরা একদিন এইসব নৌকায় করে জাভা বালি সুমাত্রা সিংহল পাড়ি দিত। জাভা দ্বীপের মন্দিরের গায়ে এখনো বাংলা লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। চন্দ্রকিরণ তার ফোটো আনিয়েছে।

"এই তো জীবন!" জাহাজের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে চন্দ্রকিরণ। যেন তার তৃষ্ণার জল। আর আমার দিকে ফিরে বলে, "ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। চোখে দেখাই সার। জীবনকে দূর থেকে দেখে গেলুম। কাছে যেতে পেলুম না।"

খিদিরপুর থেকে ফেরবার পথে আমরা কিছুক্ষণ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশে পাশে পায়চারি করলুম। ওটা কতকটা হাইড-পার্কের মতো নয় কি? চন্দ্রকিরণ বলে গেল তার ঘরের কাহিনী। মা এখনো বেঁচে। বয়স যতই বাড়ছে ততই ভয় হচ্ছে ছেলেকে বিদেশে পাঠালে আর দেখতে পাবেন না। মাকে তবু কোনো মতে বুঝ দেওয়া যায়। স্ত্রী একেবারে অবুঝ। কেন? আজকাল সব জিনিসই তো কলকাতায় পাওয়া যায়—ইস্তক স্কাইস্ক্রেপার (sky-scraper)। বিধানচন্দ্রের কৃপায় আণ্ডারগ্রাউণ্ডও হবে।

তার পর চন্দ্রকিরণের দ্বিতীয় অভিলাষ তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানো। সাধারণ তীর্থযাত্রীর মতো নয়। সাধুদের সঙ্গে সাধুর মতো। লোটা কম্বল শুধু সম্বল। ভোজনং যত্র তত্র চ শয়নং হট্টমন্দিরে। বা বিটপীতলে। গৃহিণীর বিষম আপত্তি। কোন দিন কলেরা কি টাইফয়েড হবে। কে চিকিৎসা করবে, কে শুশ্রূষা করবে? টেলিগ্রাম আসবে, সব শেষ। না, না, ওসব অনাসৃষ্টি চলবে না। তার চেয়ে দু'টো দিন সবুর করো। আমি আগে চোখ বুজি। আমাকে রওনা করে দিয়ে তুমি রওনা হবে।

বেচারা চন্দ্রকিরণ! বই কিনে গাদা করেছে মনুমেন্টের মতো। হিমালয়ের কোন কোন কন্দরে কে কে তপস্যা করছেন, তিব্বতে কোন কোন মহাত্মা যোগ করছেন, বারো হাজার ফুট উঁচুতে কোন কোন আস্তানার অবস্থান সব তার জানা আছে। কেবল একবার বেরিয়ে পড়তে পারলে হয়। তার জন্যে ক্যামেরা কেনা হয়েছে, যেমন তেমন ক্যামেরা নয় সিনেক্যামেরা। দরকার হলে সে অক্‌সিজেন য়্যাপারেটাস কিনতেও প্রস্তুত। কিন্তু তাকে যেতে দিচ্ছে কে!

সাধুদের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করে। তাঁরা বলেন এখনো সময় হয়নি। যখন হবে তখন হবে। কিন্তু তত দিন বল বয়স থাকলে তো? বুড়ো হাড় নিয়ে হিমালয়ের শীত সইতে পারবে কেন? তখন রক্ত হিম হয়ে যাবে। শরীরে প্রতিরোধশক্তি থাকবে না। পুণ্য হবে হয়তো। কিন্তু সে কি পুণ্যের জন্যে পথে বেরিয়ে পড়তে চায়! সে চায় জীবনের স্বাদ।

একঘেয়ে লাগছে তার দৈনন্দিন জীবন, তার দিনগত পাপক্ষয়। তার ছদ্মবেশী শোষণ। তার মানুষ মৃগয়া। নিজের শ্রেণীর উপর তার অশ্রদ্ধা ধরেছিল। কেবল যে নিজের শ্রেণীর পুরুষদের উপর অশ্রদ্ধা তাই নয়। নিজের শ্রেণীর মহিলাদের উপরেও। এঁরাও শোষক শ্রেণীর।

এঁরা শোষিত নন। এঁরা বাঘিনী। এঁরা হরিণী নন। ভিতরে ভিতরে তার মূল্যবোধ বদলে গেছল। মূল্যমান বদলে গেছল। অথচ সংগ্রাম করবার সামর্থ্য ছিল না। ইচ্ছাও ছিল না। সে দুর্বল প্রকৃতির লোক। বড় জোর পলায়ন করতে পারে। সম্মুখীন হতে পারে না। তার আত্মাগোপনের প্রবৃত্তি দুর্নিবার হয়েছিল। কিন্তু যতই সে আত্মগোপনের চেষ্টা করে ততই তার গৃহিণী তাকে ভুল বোঝেন। চোখে চোখে রাখেন।

চন্দ্রকিরণ চমকে উঠে বলল, "ও লোকটা কে? কেন ঘোরাফেরা করছে?"

"আমাদেরই মতো বেড়াতে এসেছে।"

"আরে না, না। ওকে আমি আরো কয়েক জায়গায় দেখেছি।" চন্দ্রকিরণ আমার কানে কানে বলল, "আমাকে নজরবন্দী করা হয়েছে।"

আমার বিশ্বাস হলো না। সস্মিতভাবে তাকালুম।

"ঘরে পাহারা। বাইরে পাহারা।" তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে বলে চলল, "ঘরে কে পাহারা দেয় তা তো জানো। বাইরে পাহারা দিচ্ছে প্রাইভেট ডিটেকটিভ।"

আমি হতবাক হলুম। এ কি কখনো সম্ভব!

"জীবনে সুখ নেই, ভাই। আপিসে আদালতে যাব। সেখানেও টিকটিকি। বইয়ের দোকানে যাব, সেখানেও তাই। গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে বেরোব, সেখানেও সেই ব্যাপার। জাহাজঘাটে বা রেলস্টেশনে আমাকে যেতে দিচ্ছে কে! দূর থেকে তার বাঁশি শুনি। কাছে যেতে পারিনে। আমার দশা তোমার বৈষ্ণব কবিতার শ্রীরাধার মতো।"

বেচারা চন্দ্রকিরণ! তার চোখ দেখলে মায়া হয়। এত বড় মানুষটা, ছোট্ট একটা শিশুর মতো অসহায়। শিশুর মতো সরল। অথচ ঘুঘু সলিসিটর। টাকার পাহাড়।

সেদিন তাকে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট অবধি পৌঁছে দিতে হলো। কোম্পানির আমলের বাড়ি। কলোনিয়াল আর্কিটেকচার। গেট থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসব, চন্দ্রকিরণ আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল। বলল, "এবার তোমাকে আমি ছেড়ে দেব না। পথ নির্দেশ করো। তারপরে যাবে।"

পথ কোথায় যে পথ নির্দেশ করব! পথ গেছে হারিয়ে।

(১৯৫০-৫৩)

এই গল্পটি খাপছাড়া ভাবে সমাপ্ত করে রেডিয়োতে পাঠ করা হয়েছিল। এখন এর শেষাংশ পুনর্লিখিত ও পরিবর্ধিত হলো। সমস্তটা পরিমার্জিত হলো।

অন্নদাশঙ্কর রায়

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে

টেলিগ্রামখানা যখন এলো তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলুম। আমার সম্পাদক-বন্ধু—থাক, নাম করব না—ওটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "য়্যাঁ! পরাশর মারা গেছে!"

তারপর তিনি বেল টিপে বেয়ারাকে দিয়ে ওখানা নিউজ ডিপার্টমেণ্টে পাঠিয়ে দিলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, "এখন একটা শোক সংবাদ লিখতে হবে। যা হোক একটা কিছু বানিয়ে লেখা চাই। কার উপর ভার দেওয়া যায় ভাবছি।"

আমি বসে বসে তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য করছিলুম। তাঁর চোখে জলের আভাস ছিল। কালো ছায়া পড়েছিল তাঁর মুখে। আঘাত পেয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু অমন কত পেয়েছেন। দু'মিনিটের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। বললেন, "শোকটা সত্য, সংবাদটাও সত্য, তবু শোক সংবাদ সত্য নয়। দেশের লোক তো জানে না, ও কী ভোগানটা ভুগেছে ও ভুগিয়েছে। অমন একটা জীবন অকালে শেষ হয়ে গেল বলে হা হুতাশ করব, না মনে মনে প্রার্থনা করব, ভাই, ইহকালে তো সুখী হলে না, পরকালে সুখী হও!"

আমার কৌতূহল উদ্রেক হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি তাঁকে চিনতেন?"

"চিনতুম না? আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বড়লোক হলে কী হয়, আমাকে ঠিক ছেলেবেলার মতোই ভালোবাসত। আমার কাছে ওর

ছিল অবারিত দ্বার, অবারিত হৃদয়। লোকে বলে, টাকায় কী না হয়! কী না হয়, তা ওর সঙ্গে মিশে বুঝেছি।"

বেশ একটা গল্পের মতো লাগছিল। বললুম, "ওসব কথা লিখছেন তা হলে?"

"কে, আমি! ক্ষেপেছেন! শোকসংবাদের একটা বাঁধা ছক আছে। যা লেখবার তা আমার সহকারীরাই লেখে। আমি শুধু যোগ্য পাত্রের উপর ভার দিয়ে থাকি। পরাশরের শোকসংবাদ লিখতে হলে হরেনকে দিয়ে লেখানোই ভালো। কাল পড়বেন ওর লেখা।" এই বলে তিনি একটা স্লিপ লিখে হরেনবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাতে ছিল কয়েকটি ছাড়া ছাড়া পদ। বড়লোক। দাতা। দেশবৎসল। গুণগ্রাহী। হরিভক্ত।

আমার হাসি পাচ্ছিল। বললুম, "হরেনবাবু তাঁকে চিনতেন?"

তিনি দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকে বললেন, "কোনো কালে না। কিন্তু টাইপটা ওর জানা আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মৃতের প্রতি কোনোরকম অবিচার হবে না। তবে ওর জীবনী থেকে ওর জীবনটাই বাদ পড়বে। দৈবাৎ আমি ওর বন্ধু ও বয়স্য। নইলে আমিও হরেনের মতো ছাঁচে ঢালাই শোকসংবাদ লিখতুম। জীবনবিহীন জীবনী।"

এবার আমি শুনতে চাইলুম আসল ব্যাপারটা। তিনি বললেন ধীরে ধীরে—

২

আমাদের সেকেণ্ড পণ্ডিত ছিলেন ওর বাবা। কথায় কথায় বলতেন, দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী। উক্তিটা ওর মনে বসেছিল। ও আমাকে

ওর মনের কথা খুলে বলত। "আর যাই হই গরিব যেন না হই।" তখন থেকেই ওর বুকনি ছিল, টাকায় কী না হয়!

দেখতে শুনতে ভালো, কিন্তু এমন কিছু সুন্দর নয় যে শুধু সেইজন্যে কেউ ওকে সেধে ঘরজামাই করবে। কিন্তু আশ্চর্যি, তাই হলো। কলেজে ভর্তি হবার মাস কয়েক পরে বাপকে না বলে আমাদের খবর না দিয়ে ও কলকাতার একটি বিখ্যাত বংশে বিয়ে করে বসল। এবং তাদের বাড়ীতেই বসতি করল। মেসে ওর জিনিসপত্র পড়ে থাকল আমার জিম্মায়। একবার ফিরে এসে দেখে গেল না ওর মা-বাপের দান।

ওর সঙ্গে কলেজে সাক্ষাৎ হলে ও মুখ নিচু করত, কথা বলত না। এক একটা আঙুলে এক একটা পাথর বসানো আংটি। পায়ে জরির লপেটা। গায়ে কোঁচানো ধুতী, গিলে করা পাঞ্জাবী। কাশ্মীরী শাল। বিয়ের জল পড়ে ওর চেহারার উন্নতি হয়েছিল। মানাত ওকে ওসব। যারা ওকে চিনত না তারা ঠাওরাত কোনো জমিদারপুত্তুর হবে। পড়াশুনায় পণ্ডিতপুত্তুর ছিল না। ওকে সবাই মিলে ঠেলেঠুলে ম্যাট্রিকটা পাশ করিয়ে দিয়েছিল। তাও প্রায় উনিশ বছর বয়সে। বার বার ফেল করার পর আমার সহপাঠী হয়।

দেখতে দেখতে ওর ভোল বদলে গেল। ওর চালচলন হয়ে উঠল বনেদী ঘরানার মতো। আমরা যারা ওকে ওর দুর্দিনে দেখেছি তারা ওকে ওর সুদিনে দেখে নিজেদের স্মরণশক্তির উপর বিশ্বাস রাখতে পারলুম না। আর সকলে ওকে এড়িয়ে চলল। কাজ কী বড়লোকের ঘরজামাইয়ের সঙ্গে বন্ধুতা করে! একমাত্র আমি টিকে থাকলুম শেষ পর্যন্ত। কেন জানিনে। বোধ হয় সাংবাদিকদের

সহজাত ঔৎসুক্য বশত। আমার সঙ্গে ও কখনো অভদ্র ব্যবহার করেনি।

কলেজের পড়ায় ওর মন ছিল না। ফেল করে নাম খারাপ করার আগেই ও মানে মানে সরে পড়ল। ওর শ্বশুরবাড়ির অনেকগুলো কারবারের মধ্যে একটা ছিল জাহাজের মালখালাসী কারবার। স্টিভে-ডোরের ফার্ম। পরাশরের খেয়াল হলো স্টিভেডোর হতে। কলকাতা বন্দরে কোনো জাহাজ ভিড়লে পরাশর গিয়ে মাল নামানোর ব্যবস্থা করত। জাহাজের খোল খালি হলে আবার অন্য মাল বোঝাই করার ভার নিত। নিজের হাতে ওকে কিছু করতে হতো না। বহু লোক লস্কর ছিল। সাহেব সুবোর সঙ্গে কথা বলাই ছিল ওর প্রধান কৃত্য। চরিতার্থতাও বটে। ওর সাধ ছিল জাহাজে চড়তে। সে সাধ এইভাবে মিটত।

আমি যখন বি. এ. পাশ করে "বেঙ্গলী"তে কাজ করছি তখন একদিন পরাশর এসে হাজির। আমি ভেবেছিলুম কাগজে নাম ছাপাবার ফন্দী এঁটে এসেছে। এখনি পকেট থেকে ফোটো বার করবে। তা নয়। বেচারার মুখে চোখে আতঙ্ক। চেহারা ভিজে কাকের মতো। সে জলুস আর নেই। একটা "রক্ষে করো, রক্ষে করো" ভাব। কারবার ফেল করেছে না বাবুরা লালবাতি জ্বেলেছেন, কী ব্যাপার কে জানে!

"তুই মেসে কখন ফিরবি?" ও জানতে চাইল।

"এই একটু পরে।"

"আচ্ছা, আমি ততক্ষণ বসে আছি। তুই চটপট সেরে নে।"

"কেন? কিছু বলতে চাস নাকি?"

"হাঁ, আমি এখন থেকে তোর সঙ্গে তোর মেসে থাকব।"

অবাক হলুম শুনে। ওর জিনিসপত্তর এই চার বছরে বেদখল হয়েছিল। কেউ তক্তাপোশ, কেউ বালিশ, কেউ তোশক ধার নিয়েছিল, ফেরৎ দেয়নি। এখন আর এক সেট সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু বড় লোকের জামাতার সহসা এ পরিবর্তন কেন?

হাতের কাজ ফেলে রেখে চললুম ওকে নিয়ে মেসে। আমার ঘরে ও আমার গেস্ট হলো। নড়বড়ে সস্তা তক্তাপোশে সতরঞ্চি পেতে পাশবালিশের উপর মাথা রেখে পরাশর বলল, "আঃ বাঁচলুম। আজ আমার সুনিদ্রা হবে।"

সে দিন ও ভাঙল না, আমিও পীড়াপীড়ি করলুম না। দাম্পত্য কলহ বোধ হয়। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। ফিরে যাবে দু'দিন বাদে। আমাদের তো বৌভাগ্য হয়নি। দাম্পত্য কলহের সৌভাগ্য হয়নি। মনে হলো কলহেও সুখ আছে, যদি মনের মতো আরেকজন থাকে। কোথায় সেই আরেকজন, কবে পাব তার দেখা!

পরাশর কিন্তু মেসেই থেকে গেল। শ্বশুরবাড়ি ফিরে গেল না। শুনলুম ও অন্য কোনো স্টিভেডোর কোম্পানিতে ঠিকাদারি করছে। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেছে। আমার সাংবাদিক কৌতূহল জেগে উঠল। আমার ভিতরে যে নিজস্ব সংবাদদাতা ছিল সে ওকে ইণ্টারভিউ করল।

"আচ্ছা, একথা কি সত্যি", আমি ওকে প্রশ্ন করলুম, "যে তুই নাকি তোর শ্বশুরের ফার্মের তহবিল ভেঙে পালিয়ে এসে সেই টাকায় ঠিকাদারি চালাচ্ছিস?"

ও চমকে উঠল। "ছি ছি! কারা এমন কথা রটায়!"

এর পরে ও যা বলল তাতে আমারি পিলে চমকে উঠল। আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে থ' মেরে গেলুম। ও যা বলছে তাই যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তো মানুষটা বেঁচে আছে বলে বিধাতাকে ধন্যবাদ দিতে হবে।

"পরাশর, তুই ভুল দেখেছিস। এ কখনো ঠিক হতে পারে না।"

"কেন, আমি কি রাতকানা? আমার ব্যবহার দেখে কি মনে হয় আমি চোখে ভালো দেখতে পাইনে? চল আমাকে নিয়ে চশমার দোকানে। পরখ করে দেখুক আমার দৃষ্টি।"

"কিন্তু বেড়ালটা যে মারা গেল এটা কি তুই স্বচক্ষে দেখেছিস?"

"বেড়ালটা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। তারপরে আর আমি সেটাকে দেখিনি। বেঁচে থাকলে তারাই সেটাকে আমার সামনে নিয়ে আসত আমার ভুল ধারণা দূর করতে। তুই যা না, গিয়ে সেটাকে নিয়ে আয়, যদি বেঁচে থাকে। তা হলে আমি নাকে খৎ দিয়ে নিজের হাতে নিজের কান মলে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাব, তোর বৌদির পা ধরে বলব, আমাকে ক্ষমা করো।"

এর পরে কী করে অবিশ্বাস করি যে বেড়ালটা বিষ মেশানো মাছ ভাত খেয়ে মারা গেছে! কিন্তু এমন কী প্রমাণ আছে যার থেকে সাব্যস্ত করতে পারি যে অপরাধটা আর কারো নয়, স্বয়ং বৌদির?

"আছে বৈকি প্রমাণ। আমার তেমন খিদে ছিল না, আমি খেতে চাইনি সে রাত্রে। আমাকে অত করে সাধবার দরকার কী ছিল! একবেলা না খেলে কি মানুষ বাঁচে না! 'এসো, ওঠ, আমার মাথা খাও, চারটি মুখে দাও, তুমি না খেলে আমার খাওয়া হবে না'—কেন, এত সাধ্য সাধনা কেন? এটা কিসের লক্ষণ?"

"বোধ হয় তুই সেদিন রাগ করে খাওয়া বন্ধ করেছিলি।"

"বাঃ রাগের কারণ থাকলে রাগ করব না! বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করেছি বলে রাগ করবার অধিকার নেই! যে কোনো ফার্মে গেলে আমাকে লুফে নেয়। আমি কি বসে বসে শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করছি, না রীতিমতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাচ্ছি? না, না, কথাটা বুঝে ছাখ। অপমানের ভাত তুই হলে মুখে দিতিস?"

আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছিল না যে স্বামীর ভাতে বিষ মিশিয়ে খেতে সাধছিলেন বৌদি। সারাজীবন বিধবা হবার ভয়, নিঃসন্তান হবার ভয়, যে কোনো নারীকে নিরস্ত করবে, যদি বা তার মনে পাপ থাকে। তা ছাড়া আগে তো কোনো দিন বৌদির প্রশংসা ভিন্ন নিন্দা শুনিনি।

"পরাশর, তুই ভুল বুঝেছিস। বিষ যদি কেউ মিশিয়ে থাকে তবে বৌদি সে কথা জানতেন না। সত্যিই তো, স্বামীর খাওয়া না হলে স্ত্রীর খাওয়া হবে কী করে!"

"প্রকাশ্যে হয় না বটে, কিন্তু গোপনে এত কিছু খাওয়া হয় যে বাকী যা থাকে তা লোক দেখানো। ও যদি সে রাত্রে উপোস করত তা হলে এমন কিছু ক্ষতি হতো না। মাঝখান থেকে বেড়ালটা বেঁচে যেত। তবে কে জানে, বাবা, দিন দু'চার পরে আবার হয়তো বিষ দিত, তখন বেড়াল হয়তো থাকত না, খিদের চোটে আমিই হতুম বেড়াল।"

আমি এবার তর্ক করলুম, "আচ্ছা, নিজে বিধবা হয়ে ওঁর কী লাভ, বলতে পারিস?"

"কেন, বিধবাবিবাহে তো বাধা নেই। ওদের বাড়িতেই একবার

হয়েছে। আমার মতো অপাত্রকে ওরা জামাই করেছিল কেন, জানিস? সমাজে পতিত হয়েছিল বলে।"

এর পরে আর কী বলবার থাকে! আমার বিশ্বাস হলো না যে বিষ দিয়েছিলেন বৌদিদি। কিন্তু পরাশরকে বিশ্বাস করানো শক্ত যে বিষ আর কেউ দিয়েছিল। ওর ঐ বদ্ধমূল ধারণা কোনো মতেই টলবার নয়। সময়ে টলতে পারে, এই ভেবে আমি হাল ছেড়ে দিলুম। আদৌ কেউ বিষ দিয়েছিল কি না, বেড়ালটা বিষ খেয়ে পালিয়ে গেছল না কাঁটা বিঁধে পালিয়ে গেছল, মারা গেল কি ফেরার হলো, এসব বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ হতে পারি নি।

পরাশর আমার মেসেই স্থায়ী মেম্বর হলো। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ওকে সেখানে থাকতে দেখে আমারও ধারণা জন্মাল যে শ্বশুরবাড়িতে ওর প্রাণ নিরাপদ নয়। ওদিকে ও ওর ঠিকাদারিতে বেশ মুনাফা দেখাতে লাগল। মেসের আস্ত একখানা ঘর ওর একার জন্যে ভাড়া নিল। এটা নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু টাকায় কী না হয়! মাসে একটা করে ভোজ দিত মেসের সবাইকে। তা ছাড়া যেই ওর ঘরে যেত সেই ওর সঙ্গে চা খেত। শুধু কি এক পেয়ালা চা! চপ কাটলেট, ফুলুরি বেগুনি, ঘুংনিদানা, জিলিপি।

আশ্চর্য! ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ কখনো আসত না ওকে ফিরিয়ে নিতে। আমি তো আশা করেছিলুম বৌদি নিজে একবার আসবেন। কই, তেমন কিছু তো ঘটল না! যত দূর জানি, তিনি একখানা চিঠিও লিখলেন না স্বামীকে। অদ্ভুত!

কয়েক বছর পরে পরাশর জাহাজের ব্যাপারে বিলেত চলে যায়। বিলেত থেকে ফিরে হেস্টিংস অঞ্চলে ফ্ল্যাট নেয়। আমার সঙ্গে ওর

কালেভদ্রে দেখা হয়। কিন্তু আমার মেসের বাবুরা ওকে অত সহজে ছাড়লেন না। তাঁদের একজনের একটি অরক্ষণীয়া বোন ছিল। দেখতে ভালো নয়, ম্যালেরিয়ায় শীর্ণ, কিন্তু অত্যন্ত স্নিগ্ধ প্রকৃতির কল্যাণী নারী। আমি তাকে দেখেছি। ভদ্রলোক আমাকেও পাকড়েছিলেন তার জন্যে। আমি ধরা দিই নি। আজ পর্যন্ত মেয়েদের সঙ্গে আমার 'দাদা' সম্পর্ক। 'ওগো' সম্পর্ক এ জীবনে হলো না।

মেয়েটির নামটাও সেকেলে। পরশমণি। পরাশরের সঙ্গে নামের মিল ছিল। কে জানে কেন পরাশরের তাকে পছন্দ হয়ে গেল। পরাশর বলল, "বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে দেখেছি। ওতে সুখ নেই। সুখ যদি চাও তো গরিবের মেয়ে বিয়ে করো। গুণ থাকলেই যথেষ্ট। রূপে কাজ নেই। এবার আমি আশা করতে পারি যে, দাম্পত্য জীবনে সুখী হব।"

আমরা বললুম, "তথাস্তু।"

ধূমধাম করে ওর দ্বিতীয় বার বিয়ে হয়ে গেল। হেস্টিংসের ফ্ল্যাটে অসুবিধা হবে বলে বৌকে রেখে এলো দেশের বাড়িতে। কলকাতায় বাড়ি খুঁজতে লাগল।

৩

সম্পাদক বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—

কলকাতায় বাড়ি খোঁজা আর ফুরোয় না। দেড় বছর পরে সেই ভদ্রলোক একদিন আমার ঘরে এসে দরজায় খিল দিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর গোপনীয় কথা আছে।

কী কথা!

পরাশর তার বৌকে কিছু দিন দেশের বাড়িতে রেখে তার পরে

পাঠিয়ে দেয় প্রসবের জন্যে বাপের বাড়িতে। প্রসবের পরে তাকে খবর দেওয়া হয় যে একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। খবর শুনে সে না গেল তার বংশধরকে দেখতে, না নিল কোনো খোঁজ। কলকাতায় তাদের আনাবার নাম করল না, দেশের বাড়িতে পাঠাবার প্রস্তাব করল না। চিঠি লিখলে উত্তর দিতে ভুলে গেল। দেখা করতে গেলে সময় নেই বলে ঘুরিয়ে দিল। এখন কী কর্তব্য।

তাই তো আমাকে তা হলে কী করতে হবে!

আমাকে যেতে হবে পরাশরের কাছে। জিজ্ঞাসা করতে হবে কী তার অভিপ্রায়। এত বড় ঠিকাদার, তার এমন কী টাকার টানাটানি যে স্ত্রীকে মাসোহারা পাঠাতে পারে না। ছেলে মানুষ করতে কি পয়সা লাগে না? ডাক্তার বদ্দি ডাকতে হয় না? আর কোনো বাপ হলে কত বার দেখে আসত, দিয়ে আসত সোনা দানা রেশম পশম। দূর এমন কিছু নয়, নদীয়া মেহেরপুর। নিতান্ত যদি সময় না থাকে পার্সেল করতে কী লাগে?

আমার মনে খট্‌কা বাধল। এ কী অনাসৃষ্টি ব্যাপার! ছুটলুম পরাশরের ওখানে। সঙ্গে নিলুম না কাউকে। পরাশর বলে পাঠাল সময় নেই। আমি বলে পাঠালুম আমার হাতে খবরের কাগজ আছে। তখন সুড় সুড় করে বেরিয়ে এলো। বলল, "কেউ বুঝবে না আমার দুঃখ। 'তুমি কী বুঝিবে সন্ন্যাসী!' আমাকে কথা দে, কাউকে বলবিনে।" এই বলে সে আমার দিকে কাতরভাবে তাকাল।

চুলে পাক ধরেছিল। চোখের কোলে কালি। মুখের চামড়া তেমন আঁটসাঁট নয়। দেখেশুনে মনে হলো বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে। এই কি সেই পরাশর!

আমি তাকে কথা দিলুম যে আর কাউকে বলব না।

তখন সে আমাকে তার দুঃখের কাহিনী শোনাল। সে যখন তার স্ত্রীকে দেশের বাড়িতে রেখে আসে তখন সেখানে ছিল তার ছোট ভাই বীরেশ্বর। সেকেণ্ড পণ্ডিত মশায়ের কাল হওয়ার পর থেকে বীরেশ্বরই. দেশের বাড়িতে থেকে ইস্কুলমাস্টারি করে। তার বিয়ে হয় নি। মা আর তিনটি বিধবা বোন আর তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার। পরাশরই বেশীর ভাগ খরচ জোগায়। পরশমণি গরিবের মেয়ে। তার সেখানে কষ্ট হবার কথা নয়। মাস কয়েক পরে কলকাতায় বাসা জুটলে স্বামীর কাছে চলে আসবে। সুতরাং ক'টা দিনের মামলা।

তার কিছুদিন পরে কলকাতায় একখানা বাড়ি পাওয়া গেল। পরাশর গেল স্ত্রীকে আনতে। কিন্তু দেশের বাড়িতে গিয়ে যা দেখল তা দেখে তার সারা শরীর জ্বলে উঠল। আর কেউ হলে একটা খুনোখুনি হয়ে যেত। কিন্তু এ যে মায়ের পেটের ভাই।

আমি ভীষণ শক পেলুম। "সত্যি বলছিস!"

"সত্যি নয় তো কী? মিথ্যে?"

"না, না, চোখের ভুলও তো হতে পারে।"

"ওই তোর এক কথা। তোর কি মনে হয় আমি রাতকানা? চল না আমাকে নিয়ে তোর জানাশুনা কোনো চোখের ডাক্তারের কাছে। আজকেই এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক।"

তার পর সে আরো খোলসা করে বলল। সে যখন বাড়ি পৌঁছয়, তখন রাত দুটো। আগে থেকে খবর দিয়ে যায় নি। কলকাতায় খাওয়াদাওয়া সেরে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে উঠেছিল। বাইরের দরজায়

ডাকাডাকি করে কারো সাড়াশব্দ পেলো না। খিড়কি দিয়ে ঢুকতে হলো। খোলাও ছিল সেটা। যে ঘরে তার স্ত্রী শোয় সে ঘরে তার একটি বিধবা বোনও শোয়। কিন্তু টর্চের আলোয় দেখা গেল যে শুয়ে আছে সে তার বিধবা বোন নয়। সে তার গুণধর ভাই।

"অসম্ভব!" আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলুম, "পরাশর, এটা তোর বিভ্রম।"

"আরে না। আমি কি আমার ভাই বোনের তফাৎ বুঝতে পারিনে?" খুনখারাবি করে বসব, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি পা টিপে টিপে আবার সেই খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলুম। ফিরতি ট্রেন ধরে পরের দিন চলে এলুম কলকাতা। বাড়ি ঠিক করেছিলুম, কিন্তু কার জন্যে গৃহ! গৃহিণী যে আমার নয়।"

আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। বললুম, "তোর চোখ যদি খারাপ না হয় তো মাথা খারাপ। রাঁচীতে গিয়ে কিছু দিন থাক।"

পরাশর এমন করুণ ভাবে আমার দিকে তাকাল যে আমার মায়া হলো। কিন্তু তার ঐ গাঁজাখুরি গল্প কে বিশ্বাস করবে! দুনিয়াতে কত রকম লোক আছে, কিন্তু কার প্রথম পক্ষ ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেয়, দ্বিতীয় পক্ষ দেওরের সঙ্গে শোয়। বেছে বেছে এই লোকটারই উপর প্রজাপতির বিপক্ষপাত!

আর পরশমণিকে তো আমি দেখেছি। তার মতো লক্ষ্মী মেয়ে কখনো এ কাজ পারে করতে! অসম্ভব, অলীক, অবাস্তব, অসত্য! পরাশরকে আমি ভয় দেখিয়ে বললুম, "তুমি কি মনে করেছ, যাদু, তোমার টাকা আছে বলে তুমি ভদ্রলোকের বোনকে বিয়ে করে অমন একটা অপবাদ দিয়ে পার পাবে! সেটি হচ্ছে না। তোমার তিন

নম্বর বিবাহের মতলব টের পেয়েছি আমি। দাঁড়াও, খবরের কাগজে হাঁড়ি ভাঙছি।"

পরাশর আমার হাত চেপে ধরে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "আমি তোর গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, ভাই। তিন নম্বর বিয়ে কোনো দিন করব না। ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়। আমার ভাগ্যে ও সুখ নেই।"

আমি কঠোর কণ্ঠে বললুম, "তবে যাও, স্ত্রীকে নিয়ে এসো। ছেলেটার কী দোষ! ওর জীবনটাও নষ্ট করবে তুমি! দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি।"

পরাশর আমার পায়ে পড়ে বলল, "মাসোহারা দিতে রাজি আছি। কিন্তু যে আমার নয় তাকে আমার কাছে রাখতে পারব না। রোজ তাকে দেখে আমার চোখে ভাসবে সেই দৃশ্য। রাগে সর্ব শরীর জ্বলবে। তাতে তারও মঙ্গল হবে না, আমারও না।"

আমি তাকে অভয় দিয়ে বললুম, "না, ভাই, আমি তোর বিরুদ্ধে লিখব না। কিন্তু ও যে তোর নয় এ কথা তুই কেমন করে জানলি।"

"ওই দৃশ্য—" সে লজ্জায় অধোবদন হলো।

"না হয় ধরে নিলুম যে এক বার ও রকম ঘটেছে। কিন্তু আগে যে সব ঘটনা ঘটেছে তার নায়ক তো তুই নিজে। সে সব ঘটনা যে নিষ্ফল গেছে তাই বা কেন বিশ্বাস করব?"

"মানছি সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু সেটা কেন আমার অনুকূলে যাবে না?"

"না, সেটা যাবে শিশুর অনুকূলে। আইন অনুসারে তুই তার জনক। ন্যায়ধর্ম অনুসারেও তুই। যা, ওকে নিয়ে আয়, কাছে রাখ, স্বীকার কর।

ওর মাকেও। যা হবার তা হয়ে গেছে। যদিও আমি বিশ্বাস করিনে যে ও রকম কিছু হয়েছে।”

পরাশর কিন্তু আমার প্রস্তাবে রাজি হলো না। বলল, “ছেলে আমার ভাইয়ের সে কথা ভেবে আমি তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। ছেলের মাকেও। সারাজীবন সাহায্য করে যাব, কিন্তু ঘরে আনব না।”

আপাতত একটা মোটা গোছের চেক আদায় করে মেসে ফিরলুম। ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললুম, “পরাশর মাসোহারা পাঠাবে। এটা তার নিদর্শন।”

তিনি অপমান বোধ করলেন। কিন্তু চেকের টাকা তুলে বোনকে দিলেন। পরশমণি যখন বুঝতে পারল যে স্বামী তাকে নেবে না, তার ছেলেকেও স্বীকার করবে না, তখন সে এক দিন জলে ডুবে মারা গেল। ছেলে মানুষ হতে লাগল মামার অন্নে। তিনি পরাশরের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন পরাশরের মনের ভাব।

এই দুর্ঘটনার পর ষোল সতেরো বছর কেটে গেল। পরাশর ফেঁপে উঠল যুদ্ধের মরসুমে। দান খয়রাত করে লঙ্গরখানা খুলে সে একজন দিকপাল বলে গণ্য হলো। লাটপ্রাসাদ থেকে কংগ্রেস আপিস পর্যন্ত সব ঠাঁই তার ঘর আছে। কোথাকার এক বৈষ্ণব সম্মিলনী থেকে তাকে ভক্তিরত্নাকর উপাধি দেওয়া হয়েছে। টাকায় কী না হয়! বঙ্কিমচন্দ্র মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত লিখেছিলেন, আমিও পরাশরের জীবনচরিত লিখতে পারতুম।

ছেলেটির যখন ষোল সতেরো বছর বয়স হলো তখন সে কলকাতা

এলো মামার সঙ্গে। দেখলুম তাকে। দেখে বড় ভালো লাগল। এমন নিষ্পাপ চেহারা তার, নামটিও "পবিত্র"। ভদ্রলোক তাকে কলেজে ভর্তি করে দিলেন। রাখলেন নিজের কাছে। ইতিমধ্যে আমি ওখান থেকে উঠে গেছি। আমার উন্নতি হয়েছে। মেসে থাকা মানায় না। বিয়ে করিনি, কিন্তু আলাদা বাসা করেছি। আমি মাঝে মাঝে পরাশরের ওখানে যাই। একদিন পবিত্রকে নিয়ে গেলুম।

ভেবেছিলুম পরাশরের পিতৃহৃদয় গলবে। কিন্তু সে তার দিকে কাঠের মতো তাকিয়ে রইল। যেন কিছু দেখতে পাচ্ছে না চোখে। পবিত্রর যথেষ্ট সংসারজ্ঞান হয়েছিল। সে যে কী ভয়ংকর আঘাত পেলো তা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। সে যেন মনে মনে বলছিল, "মা ধরণী, দ্বিধা হও।"

অমন সুন্দর ছেলেটি দিন দিন শুকিয়ে যেতে থাকল। কী হয়েছিল, জানিনে। একদিন শুনলুম সে মারা গেছে। ভদ্রলোক শোকে পাগলের মতো হয়ে গেলেন। আমার ইচ্ছা করল পরাশরকে মেরে ফাঁসি যাই।

গেলুম তাকে খবরটা দিতে। কী লাভ হতো ভেবে দেখিনি। একটু খোঁচা দেব, ব্যঙ্গ করব, এ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

কিন্তু যা ঘটল তা অভাবনীয়। পরাশর প্রথমটা হতভম্বের মতো বসে থাকল। তার পর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। আমি একটু নরম সুরে বললুম, "ভাইপোর জন্যে মরাকান্না কেঁদে কী হবে!"

"কে জানে, ভাই," সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "যদি আমারই হয়ে থাকে। আমার একমাত্র ছেলে, আমার একমাত্র সন্তান।"

বিদ্রূপের সুরে বললুম, "সবে ধন নীলমণি!"

সে বুঝতে পারল না যে ওটা বিদ্রূপ। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমার সবে ধন নীলমণি।"

তাকে আক্রমণ করে স্যাটায়ার লিখব ভেবেছিলুম, কিন্তু তার বুকফাটা কান্না শুনে আমার নিজের চোখে জল এসে পড়েছিল। বাপ তো হইনি কখনো, বাপের দুঃখ আমি কী বুঝব! পুত্রশোক যে কত বড় শক্তিশেল তা সে দিন প্রত্যক্ষ করলুম। আর মনে মনে বললুম, "ভাগ্যিস্ আমার ছেলে নয়। নইলে আমি হয়তো শক্তিশেলে মারা যেতুম।"

৪

সম্পাদকের বিবরণী শেষ হলো। তাঁর চোখের জল তিনি ধরে রাখতে পারছিলেন না। চশমা খুলে রুমাল দিয়ে মুছলেন।

আমি বললুম, "আপনি বেশ বানাতে পারেন দেখছি।"

"কেন, এটা কি বানানো গল্পের মতো লাগল!" তিনি বেল টিপে চা আনতে বললেন।

"কিন্তু খুব আশ্চর্য ঠেকেছে আমার কাছে। পরাশরবাবু কি তৃতীয় বার বিয়ে করেছিলেন?"

"না, করেনি। মেয়েদের উপর ওর আর বিশ্বাস ছিল না।"

"কিন্তু দোষটা যে মেয়েদের তার একমাত্র সাক্ষী তো পরাশরবাবু স্বয়ং। তিনি যে রাতকানা ছিলেন না তাই বা কে বলবে?"

"রাত্রে কত বার ওর ঘরে গেছি, ওর বাড়ি গেছি। প্রকাণ্ড প্রাসাদ করেছিল বালিগঞ্জ পার্কে। কই, কোনো দিন তো মনে হয়নি ও রাতকানা। দূর দৃষ্টি, নিকট দৃষ্টি দুটোই প্রখর ছিল।"

"তা হলে কি আপনি বলতে চান পরাশরবাবু যা দেখেছিলেন তাই সত্য ? এক জনের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে দু' দু'জন নারীকে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে ! একটি নিরীহ শিশুকেও সন্দেহ করতে হবে !"

"আহা, আমাকে প্রশ্ন করে কী হবে ! আমারও তো সেই প্রশ্ন। কিন্তু পরাশর যে তার ভ্রান্ত ধারণার দরুন কত কষ্ট পেয়েছে তা তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি। বৃন্দাবনে ওর অকালমৃত্যুর পর এ কথা কি বলা চলে যে লোকটা জেনেশুনে অপরের সর্বনাশ করেছে !"

"আপনি আপনার বন্ধুর দিকে টেনে বলবেনই তো।" আমি তর্ক করলুম। "আমার মনে হয় লোকটা ডাহা মিথ্যাবাদী। আমার একটা থিয়োরি আছে।"

"শুনতে পাই ?"

"আমার থিয়োরি হচ্ছে, লোকটা ছিল নপুংসক।"

"হা হা !" সম্পাদক হেসে উঠলেন। "তা হলে ছেলেটি কার ?"

আমি অপ্রস্তুত হয়ে জিভ কাটলুম। চটে গিয়ে বললুম, "তা হলে লোকটা একটা স্কাউণ্ড্রেল। একটা জানোয়ার। ওর শোকসংবাদ লিখে কেন কাগজ কলঙ্কিত করবেন !"

সম্পাদক বললেন, "আমি এ রহস্যের কূল কিনারা পাইনি। কে যে দোষী কে যে নয় ভগবান জানেন, যদি থাকেন। যে লোকটা মারা গেছে তার জীবনের ভালো দিকটা দেখানোই সভ্য সমাজের রীতি। সেইজন্যে শোকসংবাদে নিন্দাবাদ থাকে না। কিন্তু আসল কাহিনীটা তো আপনি শুনলেন। দেখুন, যদি রহস্যভেদ করতে পারেন।"

(১৯৫১)

অভিমন্যুর ব্যূহ

১

সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদের সকলেরই একে একে বিয়ে হয়ে গেছে, হয়নি কেবল ভৌমিকের। পঁয়ত্রিশ গেল, চল্লিশ গেল, পঁয়তাল্লিশও যায় যায়। আমরা তো এক রকম হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। এমন সময় এলো হলদে রঙের তুলোট কাগজের উপর চতুরানন আঁকা নিমন্ত্রণ পত্র। কার বিয়ে? না ভৌমিকের। ভৌ-মি-কের! বি-য়ে! কয়েক মিনিট লাগল বিস্ময়ের ঘোর কাটতে।

সত্যি তাই। নিমন্ত্রণ করেছেন শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্মা। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ ষোড়শীচরণের মধ্যম কুমার বাবাজীবন সাবিত্রীচরণের শুভ-বিবাহ অমুক দিন অমুক ঘটিকায় অমুক স্থানে সম্পন্ন হইবেক। "অতএব মহাশয় সবান্ধবে মমালয়ে আগমন করতঃ...” পাত্রীর নাম, পাত্রীর পিতার নাম ও নিবাসের উল্লেখ ছিল বৈকি। কিন্তু সে সব আমি লক্ষ্য করিনি। পত্রখানা ড্রয়ারে বন্ধ করে আমি ভাবতে বসলুম। ভাবতে এবং হাসতে। একটা প্রবাদ আছে ওড়িয়া ভাষায়। রেখে ঢেকে তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায়— পতিহীনারা সেই তো পতিগ্রহণ করে, শুধু শুধু বয়স অতিপাত করে।

ভৌমিকের কাছে বিয়ের প্রসঙ্গ তুললে সে বলত, "বিয়ে তো নয়, অভিমন্যুর ব্যূহ। প্রবেশের পথ খোলা, নির্গমের পথ রুদ্ধ।” সেই ভৌমিক অবশেষে অভিমন্যু হতে চলল। বরযাত্রী হতে হবে আমাকে। হাতে কাজ ছিল। বিয়ের দিন যেতে পারিনি। বৌভাতের দিন

গিয়ে দেখি বরকে ঘিরে জমিয়ে বসেছেন ব্যারিস্টার বন্ধুর দল। যা সব বিলিতী রসিকতা করছেন তা কহতব্য নয়। এক কোণে আসন নিয়ে নিরীক্ষণ করলুম বেচারার দশা। অভিনন্দনের যোগ্য নয়, সমবেদনার যোগ্য। সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মতো।

মাঝখানে একটু নিরিবিলি পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম তাকে, "কি হে, ব্যাপার কী বলো তো। কেন এত দিন করলে না? কেন করলে হঠাৎ এত বেশী বয়সে?"

"এর উত্তর দিতে হলে বলতে হয় একটা গল্প। আমার নয়, আমার গুরুর। আজ নয়, বলব আরেক দিন।"

"আচ্ছা, তা হলে নিমন্ত্রণ রইল তোমাকে আর তোমার উত্তরাকে। এসো একদিন আমাদের ওখানে। সন্ধ্যাবেলাই স্থবিধে।"

উত্তরাকে নিয়ে নয়, একাই অভিমন্যু এসেছিল একদিন আমার সঙ্গে গল্প করতে। সেদিন ভৌমিক যা বলেছিল তা যথাসম্ভব স্মরণ করে লিখছি।

২

সেকালের একজন নামকরা ব্যারিস্টার ছিলেন বিজলীবিকাশ বক্সী। বিলেত থেকে ফিরে ভৌমিক হয় তাঁর জুনিয়র। তিনি তাকে শিষ্যের মতো ভালোবাসতেন, বিশ্বাস করতেন পুত্রের মতো।

বক্সীর মৃত্যু হয় অল্প কয়েক দিনের অস্থখে। অস্থখের কথা শুনে ভৌমিক যায় দেখা করতে। শয্যাশায়ী বক্সী বললেন, "ভৌমিক, এবার বোধ হয় আমি বাঁচব না। যাবার আগে একটা কথা বলে যেতে চাই। কত বার বলতে চেয়েছি। কিন্তু বলিনি কাউকে।"

ভৌমিক মনে করেছিল কোনো প্রোফেসনাল সিক্রেট। মুখের

কাছে কান পেতে অপেক্ষা করল। বক্সী ক্ষণকাল ইতস্তত করলেন। তার পর ধীরে ধীরে বললেন, "ভৌমিক, মানুষের সমাজে একটা প্রথা আছে। সাংঘাতিক প্রথা। অথচ সম্মানিত। এই প্রথার পীড়নে কত যে জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে! তবু এর বিরুদ্ধে একটি কথা বলবে না কেউ। কত দুঃখ, কত কষ্ট এই প্রথার জন্যে! কত যন্ত্রণা, কত জ্বালা! তবু একটি কথা বলার জো নেই।"

ভৌমিক বুঝতে পারছিল না কোন প্রথার কথা হচ্ছে। সসঙ্কোচে জানতে চাইল, "কোন প্রথা, সার?"

বক্সী হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "বিবাহ।"

ভৌমিক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। "কী প্রথা, সার?"

বক্সী উত্তর দিলেন না। কেবল অসহায়ের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ভৌমিক যত দূর জানত বক্সীর পারিবারিক জীবন সুখের ছিল। ধর্মপরায়ণা পত্নী, দুই উপযুক্ত পুত্র, সুপাত্রে সমর্পিতা রূপগুণবতী তিন কন্যা। কেন তা হলে তিনি অমন কথা বললেন? কে জানে কেন? বক্সীর মৃত্যুর পর কথাটা ভৌমিকের মনে বিঁধে থাকল।

বক্সীর সতীর্থ ও সুহৃৎ ছিলেন মানসগোবিন্দ ভট্ট। সমকালীন ব্যারিস্টার ও প্রতিবেশী। ভৌমিক একদিন কথাটা তাঁর কানে তুললেন। যদি তিনি কিছু আলোকপাত করেন।

ভট্ট কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে বক্সী ওকথা বলে গেছেন। বলতে হলে তাঁকে না বলে ভৌমিককে বলার মানে?

"ভৌমিক," বলতে বলতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আবিষ্কারের পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ভট্ট বললেন, "ভৌমিক, আলোক-পাত আমি করব কী! তুমিই করলে। এতদিন আমি ভুল বুঝেছিলুম। ভেবেছিলুম বক্সীর দুঃখ তার ব্যবহারিক জীবনের ব্যর্থতা। এখন দেখছি তা নয়। হুঁ। একটা ধাঁধার জবাব মিলে গেছে। ঠিক। এই বার সব জল হয়ে গেছে।"

ভট্ট চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন, "বক্সীকে আমি প্রায়ই বলতুম, তোমার মতো ভাগ্যবান কে! অমন রাণীর মতো বৌ, অমন রাজ-পুত্তুরের মতো ছেলে, অমন রাজকন্যের মতো মেয়ে। বড় বড় বিশ হাজারী পঁচিশ হাজারী মনসবদারদেরও অমন ভাগ্য হয় না। আর তুমি সামান্য তিন হাজারী! তোমার অত সৌভাগ্য!"

ভৌমিক বলল, "সার, আপনার সময় নষ্ট করছি না তো?"

"আরে না, না। বোসো। তোমরা একালের ছেলেরা বিয়ে করবে না এক হাজারী মনসবদার না হলে। এই তো এতদিন জানতুম। এখন এসব কী শুনছি বক্সীর জবানীতে? য়্যাঁ! বিয়েই করবে না কোনো কালে! কমিউনিজম!"

খিদ্‌মদ্‌গার পেগ নিয়ে এলো। ভৌমিকও বাদ গেল না। গলাটা ভিজল। স্মরণশক্তি তেজ হলো। ভট্ট বললেন, "বড় ভালো ছেলে ছিল বক্সী। যেমন পড়াশুনায়, তেমনি চরিত্রে, তেমনি চেহারায়। ও যখন বিলেত যায় ব্যারিস্টার হতে তার আগেই ওর বিয়ে হয়ে যায়। আমারও। আমরা দুই বিরহী যক্ষ এক ঘরে বসে পত্রদূত পাঠাতুম আর আইন আলোচনা করতুম। দু'জনের ছিল দু'টো শোবার ঘর, কিন্তু একটাই বসবার ঘর।"

"একবার হয়েছিল কী," ভট্ট গলা খাটো করে বললেন, "বোলো না কাউকে। ওর পত্রদূত আমার খামে, আমার পত্রদূত ওর খামে চলে যায়। তখন আমাদের কারো খেয়াল হয়নি, হলো যখন জবাব এলো দুই যক্ষিণীর কাছ থেকে। সে এক হৈ রৈ কাণ্ড! এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। তার পর থেকে এক সঙ্গে বসে চিঠি লেখার পাট উঠে যায়। যে যার শোবার ঘরে খিল দিয়ে লিখতুম। শুধু তাই নয়। যে যার নিজের চিঠি নিজে ডাকে দিয়ে আসতুম।"

ভৌমিক মুখ ফিরিয়ে আস্তিনের আড়ালে হাসতে লাগল।

"অথচ আমার মতো বন্ধুকেও সে তার পারিবারিক অভিজ্ঞতা বলে গেল না! বয়স হলে মানুষ মনের কথা খুলে বলতে ভুলে যায় প্রাণের বন্ধুকেও। আর আমাদের প্রোফেসনটাও এমন যে বন্ধুও বন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী। শুনেছ তো সুজয় চাটুজ্যের কীর্তি। চীফ জাস্টিস ডিনারে ডেকেছেন, তবু যাবে না। কারণ বেবী পালিতকেও ডেকেছেন। অথচ মামলাটা চীফের ঘরে নয়। প্যাঙ্করিজের ঘরে। বেবীর সঙ্গে ওর রেশারেশি এমন জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যে ওরা ওদের চিরদিনের বন্ধুতাও ভুলে গেছে। তা বক্সী কেন বলবে তার অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা!"

এর পরে তিনি বক্সীর প্রোফেসনাল জীবনের উত্থান পতনের ইতিহাস বিবৃত করলেন। বক্সীর প্রধান গুণ ছিল তিনি মামলার কাগজপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন। কোনো অংশ বাদ দিতেন না। সুতরাং তথ্য সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে ওয়াকিবহাল। তাঁর দ্বিতীয় গুণ ছিল তিনি আইন সম্বন্ধে যত রকম প্রশ্ন উঠতে পারে প্রত্যেকটির উত্তর বই দেখে দেখে লিখে রাখতেন ও স্কুলের ছাত্রের মতো মুখস্থ করতেন। সওয়াল করতে উঠে তিনি বেশী সময় নিতেন না,

তাতে মাননীয় বিচারপতিদের সময় বাঁচত। এ ছিল তাঁর তৃতীয় গুণ। তাঁর বাক্‌বিন্যাসও ছিল বড় বড় কৌঁসুলীর মতো ধীর গম্ভীর। বাচালতা, রসিকতা, কথা কাটাকাটির জন্যে তিনি বিখ্যাত ছিলেন না। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ ছিল সাধারণ, কিন্তু ধোপদুরস্ত। চেহারা মাজিত ও আচরণ সহৃদয়। এই সব গুণের সমাবেশে তিনি দশ বছরের প্র্যাকটিসেই একজন উদীয়মান নেতা বলে চিহ্নিত হন।

এমন সময় হাইকোর্টের জজ হবার জন্যে তাঁর কাছে প্রস্তাব এলো। এত কম বয়সে কেউ জজ হয়েছেন বলে শোনা যায় না। তিনি অভিভূত হলেন। তাঁর নিজের খুব ইচ্ছা বার থেকে বেঞ্চে উন্নীত হতে। কিন্তু বাড়ীর লোকের ইচ্ছা আরো কিছু দিন যাক না। আগে পাঁচ হাজারী থেকে দশ হাজারী হতে হয়, তার পরে পনেরো হাজারী, তার পরে যদি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো দম নিতে কষ্ট হয় তা হলে জজ হয়ে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ঠিক তখনি। ভট্ট তাঁকে এই পরামর্শই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "তখন জজসাহেবদের একটা খানা দিয়ো আর আমাকে একটা ইঙ্গিত দিয়ো। আমিই তাঁদের সঙ্গে কথা বলব। তোমাকে বলতে হবে না।"

বক্‌সী জজ হলেন না। প্রস্তাবটা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু এর পরে দেখা গেল তাঁর পসার কমতির দিকে। অনেক দিন পর্যন্ত চার হাজারেই অনড় রইল। তার পরে তিন হাজারে নেমে স্থিতু হলো। দ্বিতীয়বার জজ হবার প্রস্তাব এলো না তাঁর জীবনে। এ দুঃখ তাঁর ভোলবার নয়। পিছনের ঘোড়া সামনে এগিয়ে গেল, উপরে উঠে গেল, মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলেন বক্‌সী।

"ভৌমিক," চুরুট টানতে টানতে বলতে লাগলেন ভট্ট, "সত্যি আমি

অবাক্ হয়েছি। বক্সী যদি বেঁচে থাকত ওকে আমি বুঝিয়ে বলতুম যে দোষটা বিবাহের নয়। দোষটা ওর নিজের। এই তো আমি জজ হইনি, কেউ কোনো দিন প্রস্তাবও করেনি, তা বলে কি আমি হতাশ হয়ে পসারে অবহেলা করেছি? ইয়ং ম্যান, আর যাই করো প্র্যাকটিসে অযত্ন কোরো না।"

এই বলে ভৌমিকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ওঠবার সংকেত। ভৌমিক বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল, তাকে পিছন থেকে ডেকে বললেন, "ভালো কথা, বক্সী সম্বন্ধে আরো কিছু জানতে চাও তো ওর বাল্য বন্ধু সব্যসাচীকে খুঁজে বার করো। বাবু সব্যসাচী কুশারী। কোথায় কাজ করেন জানিনে, শুনেছি স্কুলমাস্টার।"

ধন্যবাদ জানিয়ে ভৌমিক এগিয়ে যাচ্ছিল, তিনি আবার পিছু ডাকলেন। বললেন, "আমার মনে হয় বক্সী তোমাকে ওয়ার্নিং দিয়ে গেছে বিয়ে না করতে। ওটা সিয়েরিয়াসলি নিয়ো না। আমাদের প্রোফেসনে সাক্‌সেসফুল হতে হলে দুটি কাজে মুন্‌সিয়ানা দেখাতে হয়। এক শ্বশুর নির্বাচন, দুই সীনিয়র নির্বাচন। বক্সী নেই, কিন্তু আমি তো আছি।"

৩

দিনাজপুরের সব্যসাচী কুশারী বক্সীর বাল্য বন্ধু ছিলেন। মাঝে মাঝে কলকাতা এলে বক্সীর সঙ্গে দেখা করতেন। দেখা হতো রাত্রে কাজকর্মের অবসরে। আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত নিরালা বারান্দায়।

বক্সীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কুশারী অতিশয় বিস্মিত হলেন। কেউ

তাঁকে দয়া করে জানায়নি যে বক্‌সী মরণাপন্ন পীড়িত। জানাবে কী করে, বক্‌সী চলে গেলেন চার দিনের নোটিসে। শ্রাদ্ধের সময় তিনি কলকাতায় এলেন। ভৌমিক তাঁর সন্ধানে ছিল। তাঁকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, "মিস্টার বক্‌সী আমাকে ছেলের মতো ভালোবাসতেন। যাবার আগে আমাকে বিশ্বাস করে একটি কথা বলে গেছেন, যা আর কাউকে কোনো দিন বলেননি।"

কুশারী বললেন, "তা হলে কি আমার শোনা উচিত হবে?"

ভৌমিক বলল, "শুনলে হয়তো আপনি কিছু আলোকপাত করতে পারতেন।"

কুশারী বললেন, "তাতে কার কী লাভ হবে?"

ভৌমিক বলল, "তার উপর একজনের বিয়ে করা না করা নির্ভর করছে।"

"ওঃ তাই নাকি!" কুশারী আর্দ্র স্বরে বললেন, "আচ্ছা।"

ভৌমিক তাঁকে আহারের নিমন্ত্রণ করলে তিনি একটু ইতস্তত করলেন। তার পর খুলে বললেন, "আপনারা হলেন সাহেব, আমরা হলুম বাবু। টেবল ম্যানার্স জানিনে। হয়তো ভুল করে হাত লাগিয়ে খাব। কাজ কী আপনাকে হাসির খোরাক জুগিয়ে?"

ভৌমিক তাঁকে অভয় দিল যে, খাওয়া-দাওয়া দেশী ধরণে হবে। তখন তিনি রাজী হয়ে গেলেন। দিন ক্ষণ স্থির হলো।

যথাকালে ভৌমিক শোনাল বক্‌সীর কাছে যা শুনেছিল।

তা শুনে কুশারী জানালেন নিজে যেটুকু জানতেন।

"বিজলী আমার ছেলেবেলার বন্ধু। কৃতী হলে লোকে তাদের অকৃতী বন্ধুদের ভুলে যায়। কিন্তু বিজলী আমাকে কোনোদিন মনে করতে দেয়নি

যে সে বড়লোক ব্যারিস্টার আর আমি গরিব গুরুমশায়। বলত, এরা আমার সুদিনের বন্ধু। দুর্দিনে কেউ আমার পাশে দাঁড়াবে না। কিন্তু তুই আমার চিরদিনের বন্ধু।' অনেক দুঃখে সে ও কথা বলেছিল।

আমরা দু'জনে এক সঙ্গে এণ্ট্রান্স পাশ করি। তারপরে ও ভর্তি হয় প্রেসিডেন্সী কলেজে আর আমি রিপনে। আমি স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে কোথায় তলিয়ে গেলুম, আর ও বি.এ. পাশ করে বিয়ে করে বিলেত গেল ব্যারিস্টার হতে। আমি জেল থেকে বেরিয়ে বেসরকারী বিদ্যালয়ে পড়ানোর ভার নিলুম আর ও বিলেত থেকে ফিরে হাইকোর্ট বার-এ জাঁকিয়ে বসল। এর জন্যে ওর উপর আমার অভিমান ছিল। কিন্তু একদিন একটা কেসে জড়িয়ে পড়ে ওর দ্বারস্থ হতে হয়। তখন ওর যা পরিচয় পেলুম তাতে আমার অভিমান জল হয়ে গেল। বলল, দেশের জন্যে তুই সর্বস্ব দিলি, তোর নিজের বলতে কী আছে যে, উকীল ব্যারিস্টারকে দিবি? আর কেনই বা দিবি? দেশের কাছ থেকে তারা এত নিচ্ছে দেশকে তার বদলে দিচ্ছে কী? দিক না কিছু তোর কাজ করে দিয়ে।

বিজলী আমাকে শ্রদ্ধা করত আমার তথাকথিত দেশসেবার জন্যে। বলত, দেশ তো কলকাতায় নয়, দেশ পল্লীগ্রামে। কলকাতা হচ্ছে হাফ বিলেত। জীবিকার জন্যে এখানে পড়ে আছি, জীবিকার মান বাড়িয়ে দিয়েছি, নইলে তোর সঙ্গে জুটে দেশসেবা করতুম, সব্য। বলতে গেলে তুই যে কাজ করছিস সে কাজ আমারই কাজ। আর আমি যে কাজ করছি সে কাজ আমার পরিবারের।

একবার এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। বিজলীর কাছে চিঠি আসে হাইকোর্টের জজ হওয়ার জন্যে। আমাকে টেলিগ্রাম করে কলকাতায়

ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, সব্য, তোর কী পরামর্শ ? আমার তো মনে হয় জজ হলে আমি দেশের জন্যে কিছু করতে পারতুম।

আমি তো মুশকিলে পড়ে গেলুম। শুনলুম সবাই তাকে উল্টো পরামর্শ দিচ্ছে। তাই নৈতিক সমর্থনের জন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

সে দিন সে আমাকে যে-সব কথা বলেছিল সে-সব কখনো আর কাউকে বলিনি। আপনাকেও বলতুম না, কিন্তু দেখছি আপনাকেও সে বিশ্বাস করেছে। তা ছাড়া এর উপর আপনার বিয়ে করা না করা নির্ভর করছে। মাফ করবেন, 'আপনার' না বলে বলা উচিত ছিল 'একজনের'।

সেদিন যা শুনেছিলুম তা এমন অপূর্ব কথা যে এখনো আমার পরিষ্কার মনে আছে। সে বলেছিল, সব্য, আমার ধারণা ছিল আমার যোগ্যতার দ্বারা আমি মাসে পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করছি। কিন্তু কিছুদিন থেকে সে ধারণা টলমল করছে। মনে হচ্ছে বাইরে থেকে একদল বণিক এসে এ দেশ দোহন করছে। দোহনের ভাগ দিচ্ছে দেশী ধনিকদের। দেশী ধনিকদের কাছ থেকে বখরা পাচ্ছি আমরা ব্যবহারজীবীরা। আর আমাদের কাছ থেকে ভাগ পাচ্ছে আমাদের পরিবার পরিজন। লুটের ভাগ মিষ্টি লাগছে বলে বৌ বলছে, আরো রোজগার করো, এখন তোমার দশ বিশ হাজার রোজগারের বয়স, এখন থেকে কেন চার হাজার নিয়ে তুষ্ট হবে ? বৌ যা বলছে সেই কথাই বলছে ভাই বোন শালা শালী আত্মীয় স্বজন। এ দিকে আমি যে বিবেকের বোঝা বয়ে দিন দিন নুয়ে পড়ছি তা কি কেউ লক্ষ্য করছে ? টাকা দেখলে ওদের লোভ বেড়ে যায়। আর আমার মনে খটকা বাধে এ কি আমার হক্

পাওনা! সত্যি কি আমি এর যোগ্য? না এটা আসলে একপ্রকার লুটের বখরা?

বিজলীকে আমি পরামর্শ দিলুম, যাতে তোমার বিবেকের জ্বালা কমে তাই কোরো। সে বলল, তা হলে কালকেই লিখে জানিয়ে দেব জজ হতে আমি রাজী।

এক রাত্রের মধ্যে কী যে ঘটে গেল জানিনে, পরের দিন চিঠি গেল—নারাজ।

বছর কয়েক পরে যখন ওর সঙ্গে এই এই নিয়ে কথাবার্তা হয় ও বলে, সারা রাত কার্টেন লেকচার শুনে অতিষ্ঠ হয়ে স্থির করলুম জজের চাকরি নেব না, কিন্তু চার হাজারের বেশী রোজগার করব না। এই সিদ্ধান্ত এতদিন মেনে এসেছি। এখন মনে হচ্ছে আরো এক হাজার কমানো উচিত। কেননা স্ত্রী তো আমার কাছে থাকেন না, কার জন্যে এত উপার্জন করব?

সে কী হে! স্ত্রী তোমার কাছে থাকেন না!

না, ভাই। তিনি যখন শুনলেন যে, আমি স্বেচ্ছায় আমার আয় চার হাজার নির্দিষ্ট করেছি তখন কেঁদে ফেললেন। বললেন, যদি জানতুম যে, তোমার ক্ষমতা নেই তা হলে কিছু মনে করতুম না। কিন্তু আছে তোমার ক্ষমতা, পারো তুমি দশ হাজারে উঠতে। তুমি যদি এই বয়সে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল হানো তা হলে বুড়ো বয়সে তোমার সঞ্চয় বলতে কিছু থাকবে না, আর রোজগার তো বুড়ো বয়সে কমতে কমতে হাজারে কি পাঁচশোয় ঠেকবে। এই যদি তোমায় মনে ছিল তবে বিয়ে করতে গেলে কেন? ছেলেমেয়ের বাপ হতে গেলে কেন? আমার যা হবার হবে, হয়তো দরজায় খিল দিয়ে ঠাকুরদেবতা নিয়ে

পড়ে থাকব, কিন্তু ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ কী হবে ? মেয়েদের বিয়ে দেবে কী করে ? ছেলেদের বিলেত পাঠাবে না বুঝি ?

এর উত্তরে তুমি কী বললে ?

বললুম অনেক কথা। বললুম আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে তোমার ভুল ধারণা আছে বলে তুমি ভুল বুঝছ। বাস্তবিক আমার ক্ষমতা অতদূর নয়। আজকের দিনের এই সামাজিক ব্যবস্থা যদি বদলে যায় তা হলে উকীল ব্যারিস্টারের আয় কিছুতেই এত বেশী হতে পারে না। এ ব্যবস্থা বদলে যাবেই। তখন দেখবে চার হাজার টাকা বড় কম নয়। ছেলেরা যদি বিলেত যেতে চায় নিজের চেষ্টায় যাবে। মেয়েরাও যদি বিয়ে করতে চায় তবে নিজের চেষ্টায় করবে, নয়তো লেখাপড়া শিখে কাজকর্ম করবে।

তার পর ?

তার পর তিনি 'শক' পেয়ে হতবাক হলেন। কয়েক দিন কথা বললেন না। একদিন দেখি তিনি আমার হাতে এক গোছা চাবি ধরিয়ে দিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করছেন। জিজ্ঞাসা করে কোনো জবাব পেলুম না। বাপের বাড়ি থেকে গাড়ী এসে তাঁকে নিয়ে গেল। সেই যে তিনি গেলেন তার পর আর আসবার নাম নেই। কতবার লোক পাঠিয়েছি, নিজে গেছি। কিন্তু তাঁর ঐ এক কথা। বুড়ো বয়সে খাবে কী ? খাওয়াবে কী ? শ্বশুরমশায় তো আমাকে ছোট ছেলের মতো হিতোপদেশ শুনিয়ে দিলেন। বললেন, পুরুষের প্রথম কর্তব্য তার স্ত্রীপুত্রকন্যার প্রতি। আগে ওটি করো, তার পরে বিবেকের দাবী মানবে। শ্বশুরপুত্র বললেন, বিবেক বিবেক করছ, বিবেক কি তোমার একার আছে, আর কারো নেই ? বিবেক আছে বলেই তো বড় বড়

কৌসুলিরা মদ খেয়ে তার হাত থেকে রেহাই পান, কেউ কেউ আবার আরেকটা ম-কার জুড়ে দেন। তাঁদের স্ত্রীরা এটা বোঝেন, তাই ক্ষমা করেন। কিন্তু বুঝতে পারেন না, ক্ষমাও করেন না, তোমার মতো পাগলকে। তুমি যদি যথেষ্ট গোল্ড্ মোহর কামাও তা হলে তোমার সাত খুন মাফ। নয়তো তুমি হাজার ভালো মানুষ হলেও তোমার মাফ নেই, বিজু।

অদ্ভুত! অদ্ভুত! তার পরে?

তার পরে শাশুড়ী ঠাক্রুন বললেন, ঠিক এই রকমটি হয়েছিল আমার দাদার, তিনি আলিপুর বার-এর প্রধান। তিনি গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে শান্তি পেলেন। গুরু বললেন, বাবা, তোমরা হলে গৃহী আর আমরা হলুম সন্ন্যাসী। আমাদের বেলা যা নিয়ম তোমাদের বেলা কি তাই? পারো তোমরা কামিনী ত্যাগ করে থাকতে? তা যদি না পারো তবে কাঞ্চন ত্যাগ করে বাঁচবে কী করে? আশ্রিতদের বাঁচাবে কী করে? হে পরন্তপ, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করো। আমি তোমার গুরু, আমি তোমাকে আদেশ করছি, যাও, অকাতরে অর্থ উপার্জন করো। উদ্বৃত্ত ধন সাধুসেবায় ব্যয় করো। আমি তোমাকে সর্ব পাপ হতে মুক্ত করব। মা শুচ।

চমৎকার! চমৎকার! তার পরে!

তার মানে লুটের ভাগ গুরুকেও দিতে হবে। তা হলে নির্বিবেক হয়ে লুটের ধনে পকেট ভরতে পারব। শুঁড়িকে দিলে মনে হবে পাপ করছি। ছুঁড়িকে দিলে মনে হবে মহাপাপ করছি। কিন্তু গুরুকে দিলে মনে হবে সর্ব পাপ হতে মুক্ত হবার জন্যে ইনসিওর করছি। আমার বয়স্যদের মধ্যে কয়েকজন গুরুবাদী আছেন। দেখেছি তাঁরা গুরুর

পায়ের কাছে বসে তত্ত্বকথা শুনছেন। সেই পরম পুরুষ তাঁদের বিবেককে ঘুম পাড়াবার জন্যে যে-সব ঘুমপাড়ানী বচন শোনাচ্ছেন সে-সব তাঁদের কাছে অমৃতসমান। কিন্তু কী করব, অজ্ঞেয়বাদী আমি, আমার তো অত সহজে পরিত্রাণ নেই! আমার উপার্জন চার হাজার থেকে তিন হাজারে নেমে আসতে চায়। তাতে আমারই কুলোয় না, গুরুকে দেব কী?

এর পরে বিজলী আমাকে আর একটা খবর দেয়। বলে, এক দিন দেখি যে একজন সাধুবাবা এসে হাজির। বললেন তিনি গুরু। তখন আমি জানতুম না যে তিনি আমার স্ত্রীর গুরু। জানলে হয়তো আদর আপ্যায়ন করতুম, যদিও শিষ্য হতুম না কিছুতেই। কিন্তু অজ্ঞানবশত তাঁর সঙ্গে আমি একটু রুক্ষ ব্যবহার করি। তর্ক করতে করতে বলে ফেলি, ভারতবর্ষে সাধুসন্ন্যাসীর লেখাজোখা নেই। গত তিন চার হাজার বছরে অন্তত তিন চার কোটি সাধুসন্ত জন্মেছেন। একজনের নাম করতে পারেন যিনি সতীদাহ প্রথা উঠিয়ে দিতে চেয়েছেন! আর যায় কোথা! সাধুজী আমাকে দশ কথা শুনিয়ে দিলেন। আমি ম্লেচ্ছ। আমি হিন্দু ধর্ম ধ্বংস করতে এসেছি। ভেবেছিলুম ব্যাপারটা এখানেই মিটল। তা নয়। দিন দুই পরে আমার স্ত্রী লিখে পাঠালেন, তুমি আমার গুরুকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছ। আমি নিজের অপমান সইতে পারি, গুরুর অপমান সইতে পারিনে। আমি এর উত্তর লিখলুম, এতকাল জানতুম পতি পরম গুরু। এখন থেকে জানলুম গুরু পরম পতি। কী কুক্ষণে ও কথা লিখেছিলুম। দিন কয়েক পরে খবর এলো আমার স্ত্রী তীর্থ করতে চলে গেছেন। তাঁর গুরুর সঙ্গে সদলবলে।

সর্বনাশ! তা হলে তুমি করছ কী?

করবার কী আছে? আমার দিক থেকে নতিস্বীকার না দেখলে কি তিনি ফিরবেন যে ফিরিয়ে আনতে যাব! আমি তিন হাজারে নেমেছি ও যে দুটি সন্তান আমার সংসারে মানুষ হচ্ছে তাদের সুশিক্ষা দিচ্ছি। এক দিন যদি তারা দাঁড়ায় তো শিক্ষার জোরে দাঁড়াবে, বিত্তের জোরে নয়। বুজরুকির জোরে তো নয়ই।

আমি বিজলীকে আমার নৈতিক সমর্থন জানালুম। তবে ভেবেচিন্তে পরামর্শ দিলুম স্ত্রীর সঙ্গে সন্ধি করতে। বিয়ে যখন করেছে তখন একটু আধটু নতি স্বীকার করতে হবে বৈকি। তা শুনে সে জ্বলে উঠল। নতি স্বীকার করতে হবে বিয়ে করেছি বলে! এমন জানলে বিয়েই করতুম না। সন্ধি! সন্ধি যদি না করতুম তো আমার স্থান হতো হাইকোর্টের বেঞ্চে, চীফ জাস্টিসের পাশে। যত রাজ্যের লুটেরার সঙ্গে মাখামাখি করতে হতো না।

বছর খানেক পরে আবার যখন ওর সঙ্গে দেখা হয় তখন শুনি বৌদি ফিরেছেন, কিন্তু ঠাকুরঘরে সমস্ত ক্ষণ কাটান, রাত্রে অসিধার ব্রত। বলেন, সামাজিকতা করব যে, রসদ কোথায়? যারা পার্টিতে আসবে তাদের কী খেতে দেব, যাদের পার্টিতে যাব তাদের কী উপহার দেব, কী পরে বেরোব লোকের সামনে? তিন হাজার টাকায় কী হয়?

৪

ভৌমিক এত কথা জানত না। তার ধারণা বক্সীর পসার পড়ে যাওয়ায় মনে দুঃখ ছিল। এ যে আর একটা জগৎ আবিষ্কার! মানুষ স্বেচ্ছায় তার প্র্যাকটিস কমিয়ে দেয়, দিয়ে স্ত্রীর বিরাগভাজন হয়! কুশারীকে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, এ কথা কি সত্য যে তিনি হাইকোর্ট

থেকে দ্বিতীয় বার জজ হবার প্রস্তাব প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রথম সুযোগই তাঁর শেষ সুযোগ হয়? এবং তার ফলে তাঁর মন ভেঙে যায়? শরীরও?"

কুশারী বললেন, "কী করে সত্য হবে? ছোট ছেলের জন্মের পর বৌদি ওকে পই পই করে বলেন, জজ হতে চেয়েছিলে, যাও, তাই হওগে। এবার আমি বাদ সাধব না। কিন্তু তত দিনে ওর প্রত্যয় জন্মেছিল জজরাও সামাজিক ব্যবস্থার কল্যাণে ধনবান। নইলে অত আয় তাঁদের প্রাপ্য নয়। অত ব্যয়ও অনাবশ্যক বা অনুচিত। যে খানা দেয় সে কি নিঃস্বার্থ ভাবেই দেয়, না ওটা তার স্বার্থসিদ্ধির কৌশল? তুমি তাকে পাল্টা খানা দিলে সেটা কি তোমার বাজে খরচ নয়! অথচ না দিলেও মনের ভিতর কাঁটা খচখচ করে। যার সঙ্গে এত কাল খানাপিনা করে এসেছি সে যদি ডিনারে ডাকে তা হলে সরাসরি 'না' বলতে পারিনে। বলতে হয় ডাক্তারের হুকুম নেই, গ্যাসট্রিক আলসার আছে কিংবা গুরুর নিষেধ, মন্ত্র নিয়েছি কিনা। এর চেয়ে জজ না হওয়াই ভালো।

বিজলীর দিক থেকে বিন্দুমাত্র জোগাড় ছিল না। ওর এক ব্যারিস্টার বন্ধু ছিলেন, এখনো আছেন, মানসগোবিন্দ ভট্ট। তিনিই উদ্‌যোগী হয়ে নিজের বাড়ীতে খানা দেন। কথাটা আকারে ইঙ্গিতে চীফ জাসটিসের কাছে পাড়েন। য়্যাডভোকেট জেনারেল সেখানে ছিলেন। তিনি বিজলীকে ধরে নিয়ে চীফের পাশে বসিয়ে দেন, নিজে সরে গিয়ে বসেন বিজলীর চেয়ারে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। বিজলী তো মিথ্যা বলবে না। প্রশ্নের উত্তরে বলল, আমার আয় আগে পাঁচ হাজার ছিল, এখন তিন হাজার। তা শুনে য়্যাডভোকেট জেনারেল

ভ্রূকুটি করলেন। ভট্ট তাঁর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, ইউ মীন আগে তিন হাজার ছিল, এমন পাঁচ হাজার। বিজলী মাথা নাড়ল। পরে এক দিন চীফ বলেছিলেন য়্যাডভোকেট জেলারেলকে। মানছি বক্সীর মতো বিদ্বান ক্যালকাটা বার-এ খুব বেশী নেই। কিন্তু যার পসার পড়তির মুখে, পড়তে পড়তে তিন হাজারে ঠেকেছে, তাকে চার হাজার দিলে অপাত্রে দান হয়। হী ইজ নট ওয়ার্থ ইট। বক্সীর জন্যে আমি দুঃখিত। ওঁকে যখন জজ হতে অনুরোধ করা হয়েছিল তখন উনি প্রত্যাখ্যান করতে গেছলেন কেন?

আসলে ওইখানেই ভুল। প্রত্যাখ্যান যে করে সে আবার অনুগ্রহ চায় কোন মুখে? বিজলী শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। অনুগ্রহ সে চায়নি। কে যে তার হয়ে চেয়েছে তাও সে জানে না। বৌদি শুনে বললেন, তখন তো কেউ এমন কথা বলেনি যে প্রত্যাখ্যান করো। আমি শুধু বলেছিলুম সবুর করলে কেমন হয়। তা আমার কোন কথাটা তুমি শোন যে সেই কথাটাই গুরুবাক্যের মতো শুনলে, শুনেই প্রত্যাখ্যান করে বসলে? হায় হায়! এখন আমার কোলের বাছার কী হবে! এমন যার বাপ সে কি কোনো দিন মানুষ হবে, না মোক্তার হবে, না প্লীডার হবে! যাক, তত দিন আমি সংসারে থাকলে তো। গুরু হে, কবে আমাকে উদ্ধার করবে? কবে তোমার রাঙা পায়ে ঠাঁই হবে?

বিজলী ওদিকে প্রায় নাস্তিক হয়ে উঠেছিল। গুরু তার চোখে একটা গুরুতর উপদ্রব। সে যখন কোর্টে যেত তখন তার চোখে পড়ত না, কিন্তু কানে যেত যে গুরু মহারাজ এসেছিলেন। কিন্তু এই নিয়ে একটা অনর্থ বাধুক এটা সে চাইত না। একে তো আর্থিক বিষয়

নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে মনান্তর, তার উপর পারমার্থিক বিষয় নিয়ে বিরোধ ঘনাতে থাকলে পারিবারিক শান্তিভঙ্গ অনিবার্য। গুরুকে গলাধাক্কা দেবার জন্যে তার হাত নিশপিশ করত, কিন্তু সে ভালো করেই জানত যে গুরুর গলায় হাত মানে স্ত্রীর গলায় হাত। সেইজন্যে সে গুরু মহা-রাজকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলত। বলত, পাগলা কুকুরকে এড়িয়ে চলি, পাগলা ষাঁড়কেও। তেমনি এইসব গুরুতর আপদকেও।

বৌদির কিন্তু বিশ্বাস সংসারটা যে চলছে সেটা মহারাজ কৃপা করে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বলে। নইলে তিন হাজার টাকায় কখনো সংসার চলে! এমন পরম কারুণিকের জন্যে যদি কিছু খরচ করতে হয় তবে কি তার হিসেব রাখতে আছে! বাজারে যদি কিছু দেনা দাঁড়িয়ে যায় তা হলে কি স্বামীকে জানাতে আছে! নিজের গয়না বেচে শোধ করা যাবে, যদি আর কোনো উপায় না থাকে। বৌদি মানুষটি বড় সরল। যদিও বেশ সংসারী। কত ধানে কত চাল ঠিক জানতেন। শুধু চিনতেন না তাঁর স্বামীকে, আর তাঁর গুরুকে।

এক দিন এক পাওনাদারের বিল পেয়ে বিজনীর তো চক্ষু স্থির। প্রায় দু'হাজার টাকার সরঞ্জাম কেনা হয়েছে গুরু মহারাজের আশ্রম সাজানোর জন্যে। আধুনিক গুরু, তাঁর আধুনিক আশ্রম। কৌচ সোফা গদিআঁটা চেয়ার এসব যদি না থাকে তবে বড় বড় য়্যাটর্নি ব্যারিস্টার সওদাগর মুৎসুদ্দি, বিশেষ করে তাঁদের সহধর্মিণীরা, বসবেন কোথায়? ছেঁড়া মাদুরে? তা হলে কলকাতার উপকণ্ঠে আশ্রম স্থাপনের সার্থকতা কিসের? যেখানে যেমন সেখানে তেমন। কলকাতা কলকাতা, ঝিনেদা ঝিনেদা। গুরুর প্রয়োজন গুরুতর, এর উপর নির্ভর করছে তাঁর গুরু-গিরি। এইজন্যেই তিনি দিনের পর দিন তত্ত্ব কথা শোনাতে এসেছেন।

বিজলী বুঝতে পারল এ বিল মিটিয়ে না দিলে তাকে ছোট আদালতে ছোটাছুটি করতে হবে। আর মিটিয়ে দিলে করতে হবে বড় আদালতে ছোটাছুটি। কেননা ঐ টাকাটা রোজগার করা চাই। এর জন্যে আবার সলিসিটারের মোসাহেবী করতে হবে। তার বাঁধা কয়েক ঘর মক্কেল ছিলেন, তাঁরাই এতকাল তার হাতে মামলা সঁপে দিয়েছেন, অবশ্য সলিসিটারের মারফৎ। এখন নতুন মক্কেল খুঁজতে হবে। কী জ্বালা!

স্ত্রীকে বলল, দয়া করে আমাকে বলো এ রকম বিল এই শেষ না এই প্রথম ?

স্ত্রী বললেন, কী করে জানব ? হিসেব তো রাখিনি।

সর্বনাশ! তা হলে দু'হাজার টাকায় কী হবে! আরো টাকা জোগাড় করতে হবে। আরো রোজগার করতে হবে। মোসাহেবী করতে হবে। টাউট লাগাতে হবে।

কেন ? আমার গয়না বিক্রী করে হয় না ? দিচ্ছি এনে তোমাকে।

বিজলী সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার আইচ তার বন্ধু। আইচকে সব কথা খুলে বলল। 'গুরুকে কলকাতা থেকে সরানো দরকার। নইলে কত গৃহস্থের সংসার ছারখার হবে! আইচ বলল, বক্সী, তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু তুমি কি জানো না যে পুলিশ অফিসারদের অনেকেরই গুরু আছেন? একজনের নাম করতে পারি, দণ্ডবিধি আইনের এমন ধারা নেই যা সে ভঙ্গ করেনি। তবু তার এমন মুরুব্বির জোর যে আমরাও হালে পানি পাইনে। ফৌজদারি সোপর্দ করলে তোমরাই তাকে খালাস করিয়ে দেবে। উকীল ব্যারিস্টারদের মধ্যেও তার শিষ্য আছেন। যাও, যাও, বিলটা মানে মানে মিটিয়ে দাও। রোজগার করবে দু'দিনে।

হাইকোর্টের রাস্তায় সোনা রূপো ছড়ানো। দু' হাতে কুড়োও। হাইকোর্ট তো নয়, আলিবাবার গুহা। আলিবাবার মতো নেমে যাও, কুড়িয়ে নিয়ে এসো। তবে, হাঁ, বেরিয়ে আসার পথ খোলা পেলে হয়। এক সি আর দাশই পেরেছেন।

আমি তখন অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে পড়াই। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আমার আস্তানা। বিজলী এসে আমার আস্তানায় হাজির। বলে, আমিও সি আর দাশের মতো প্র্যাকটিস ছেড়ে দেব।

আরে না, না! সে কী হয়! আমি তাকে নিরস্ত করি। বৌদিকে গিয়ে বলি, বিজু তো চিত্তরঞ্জনের মতো ফকির হতে চলল। কী করে ঠেকাবেন ঠেকান। ও যদি স্বদেশী করে জেলে যায় তা হলে সংসারটা চালিয়ে নিয়ে যাবে কে? গুরু মহারাজ?

তিনি তা শুনে হতভম্ব হলেন। তাঁর গুরুও তাঁকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। তিনি ভেবে দেখলেন স্বামীজীর চেয়ে স্বামীই বড়। গুরু তো শুধু গুরু। পতি পরম গুরু।

কোনো মতে জোড়াতালি দিয়ে মিটিয়ে দেওয়া গেল সমস্যা। বিজলীকে জেলে যেতে হলো না, মোসাহেবী করতে হলো না, টাউট লাগাতে হলো না। স্ত্রীর নামে ডাকঘরে কিছু জমেছিল, সেই প্রথম যৌবনের য়্যাকাউণ্ট, স্বামী-স্ত্রী কারো মনে ছিল না। আপাতত একটা বিল তো চুকল। পরে দেখা যাবে আর কোনো বিল আসে কি না, এলে ভাবা যাবে।

কিন্তু ওদের দাম্পত্য সম্পর্ক আর জোড়া লাগল না। বিজলীর সমস্ত ক্ষণ ভয়, এই রে! আর একটা বিল! এটা পাচ হাজার টাকার!

এবার গেছি! বৌদির সমস্ত ক্ষণ ক্ষোভ, সামান্য দু'হাজার টাকা, একটু চেষ্টা করলে দু'দিনে অর্জন করা যায়, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সেটুকু চেষ্টা করবেন না। গেল আমার সারা জীবনের সঞ্চয়। আর কি কোনো দিন অত টাকা জমবে! ছেলে মোক্তার হবে, মেয়ে মুহুরীর ঘরে পড়বে। হায় রে কপাল!

জেল থেকে ঘুরে এসে দেখি বিজলীর বড় মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ। য়্যাটর্নির ঘরে। খরচ একটু বেশী হলো বৈকি। স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে বিজলীকে কিছু দেনা করতে হলো। বন্ধক দিতে হলো পৈত্রিক ভদ্রাসন, হুগলী জেলায়। কয়েক বছর পরে মেজ মেয়ের বিয়ে। শ্বশুরবংশ জাহাজের স্টীভেডোর। কলকাতার বাড়ীর একাংশ বন্ধক না দিয়ে উপায় ছিল না। এই তো কিছু দিন আগে ছোট মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। শেয়ার মার্কেটের ব্রোকার ওরা, বিজলীর শেয়ার যা কিছু ছিল মেয়ের নামে জামাইয়ের নামে লিখিয়ে নিল। বড় ছেলের একটা বড় চাকরি জুটেছে, বিলিতী তামাকের কারবারে। ছোট ছেলে কলেজে পড়ছে। বাপের প্র্যাকটিসটা ওই এক দিন পাবে। পুরোনো মক্কেলদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে হিতৈষীরা এই রকম একটা বন্দোবস্ত করছেন।

কুশারীর জবানবন্দী শেষ হলে ভৌমিকের জেরা আরম্ভ হলো।

"তবে যে আপনি বলছিলেন দুটি সন্তানকে মিস্টার বক্সী নিজের হাতে মানুষ করেছিলেন। কোন দুটিকে?"

"বড় ছেলেকে আর বড় মেয়েকে। কিন্তু সে আর ক'টা দিন! তাদের মা তাদের ভার নিলেন। সকালবেলা কাঁচা ছোলা চিবিয়ে বেচারিদের যা কষ্ট হয়েছিল, তা পুষিয়ে গেল রুটি মাখন কেক বিস্কুট

খেয়ে। তার সঙ্গে প্রচুর দিশী মিষ্টি সিঙ্গাড়া কচুরি। ইঙ্গবঙ্গ আর কাকে বলে! এটাও খাব, ওটাও খাব। বিজলী গুরুকুলের আদর্শে শিক্ষা দিচ্ছিল। বৌদি দিলেন গুরুভগিনী কুলের আদর্শে।"

ভৌমিক আশ্চর্য হয়ে বলল, "স্ত্রীর উপর তাঁর এতটুকুও জোর ছিল না। অথচ এমন শক্ত লোক তিনি!"

কুশারী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "শক্তও ছিল, নরমও ছিল। বলত, ছেলেরা যদি বাপের শিক্ষার চেয়ে মায়ের শিক্ষা পছন্দ করে, তা হলে আমি তাদের কেমন করে বোঝাব যে, মায়ের শিক্ষা কুশিক্ষা? তা হলে মাকে তারা শ্রদ্ধা করবে কী করে! আর মেয়েরা তো সচরাচর মায়ের শিক্ষাই নিয়ে থাকে। বাপের সঙ্গে তাদের কতটুকু সম্পর্ক! মোট কথা," কুশারী যোগ করলেন, "স্ত্রীর সঙ্গে যে আদি প্রশ্ন নিয়ে বিরোধ চলছিল সে প্রশ্নের উপর জোর দিতে হলে অন্যান্য প্রশ্নের উপর থেকে চাপ সরিয়ে নিতে হয়। মামলায় আপনারা কী করেন?"

ভৌমিকের মনে পড়ে গেল যে, ছেলেমেয়েদের প্রসঙ্গ এসে মূল কাহিনীটাকে চাপা দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, "জেল থেকে বেরিয়ে এসে আপনি বড় মেয়ের বিয়ে দেখলেন। আর কিছু দেখলেন কি?"

"দেখলুম গুরুর প্রভাব অনেকটা কমেছে। তবে ধর্মিষ্ঠতা যেমনকে তেমন। বিজলীর তাতে আপত্তি ছিল না। সে বলত, স্ত্রীর কাছে স্বামীর সত্যিকারের চাওয়া চারটি। এক ইন্দ্রিয়সুখ। দুই সন্তানসুখ। তিন গৃহসুখ। চার সঙ্গসুখ। ইন্দ্রিয়সুখ যথেষ্ট হয়েছে, আর চাইনে। সন্তানসুখ যা পেয়েছি যথেষ্টর বেশী। বাকী থাকে গৃহসুখ আর সঙ্গসুখ। এ দুটি সুখ আমার হতে পারত যদি স্ত্রীর শর্তে রাজী হতুম। দু'জনে আমরা একই ধর্মশালায় আছি, একে যদি গৃহসুখ বলতে চাও

বলো। কিন্তু সঙ্গসুখ কী করে বলবে? ও কি আমার সঙ্গিনী, না আমি ওর সঙ্গী?"

ভৌমিক ঠিক এই কথাটি জানতে চেয়েছিল। জেনে তার সংশয় ভঞ্জন হলো। বলল, "ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। এবার আমাকে ভেবে দেখতে হবে, করব কি করব না বিবাহ।"

কুশারী বললেন, "করবেন বৈকি, নিশ্চয় করবেন। একজনের একটা কাহিনী শুনেই আশা করি বিবাহের উপর বিরূপ হবেন না। বিবাহের সৃষ্টি হয়েছে লক্ষ জনের হিতের জন্যে। একজনের সুখের জন্যে নয়। বিজলী আমার বন্ধু হলে কী হয়, ওর সঙ্গে আমি একমত নই। ও চেয়েছিল একটি নয়, দুটি নয়, চার চারটি সুখ। আমি তো ওর যে কোনো একটা পেলে বর্তে যেতুম।"

"সে কী! আপনি তা হলে একটাও পাননি!"

"না, মিস্টার ভৌমিক। আমার বিয়ে সুখের জন্যে নয়, হিতের জন্যে। সকলের যাতে মঙ্গল আমারও তাতে মঙ্গল। এই করেই জীবনটা কেটে গেল। এখন স্বরাজটা চোখে দেখে যেতে পারলে বাঁচি।"

তিনি বিদায় নিলেন। ভৌমিক শুনতে পেলো তিনি আপন মনে চাপা গলায় বলছেন, "অভিমন্যুর ব্যূহ। প্রবেশের পথ খোলা, নির্গমের পথ বন্ধ।"

৫

ভৌমিকের জবানীতে বক্সীর জীবনী শুনে আমি ব্যথিত হয়েছিলুম। বললুম, "এ তো গেল তোমার এত দিন বিয়ে না করার কারণ। কিন্তু এত কাল পরে হঠাৎ বিয়ে করার কারণটা তো বললে না?"

"হা হা হো হো।" সে হেসে উঠল। বলল, "তা হলে তোমাকে আর একটা গল্প শোনাতে হয়। আজ তার সময় নেই। সময় হয়নিও।"

মনটা ভারাক্রান্ত ছিল। পীড়াপীড়ি করলুম না। ভৌমিক নিজের থেকে বলল, "সব জিনিসের কি সব সময় কারণ থাকে? অন্তত. বিয়ে তেমন জিনিস নয়। এ জিনিস কেন হয়, কবে হয়, কার সঙ্গে কার হয়, এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই জেনো। হয়েছে, এই হচ্ছে সার কথা ও শেষ কথা। বাকীটা পরে এক দিন শুনবে।"

(১৯৫২)

ল্যাভেণ্ডার

১

সন্ধ্যাবেলাটা বেশ আনন্দে কাটল। ভদ্রলোক স্বয়ং ইংরেজী গান গেয়ে শোনালেন। হাসির গান, কিন্তু নিছক হাসির নয়। ফল্গু ধারার মতো প্রচ্ছন্ন ছিল একটা করুণ মধুর সুর। আর তাঁর স্ত্রী শোনালেন সেকালের রবীন্দ্রসঙ্গীত। "মায়ার খেলা"য় তিনি অভিনয় করেছিলেন প্রথম বয়সে। তারই অবিস্মরণীয় অবশেষ। আর তাঁর দুই কন্যা শোনালেন মীরার ভজন। দিলীপকুমারের ঢঙে।

তার পরে তাঁরা চার জনে মিলে গাইলেন অতুলপ্রসাদের প্রাণ-মাতানো গান "উঠ গো ভারতলক্ষ্মী।" মনে মনে আমিও তাঁদের সঙ্গে মিলে গেলুম।

দেশবন্দনার রেশ যখন নিঃশেষ হয়ে এলো তখন আমি ধীরে ধীরে বিদায় নিতে উঠলুম। এসেছিলুম তাঁদের ওখানে 'কল' করতে। পরিচয় দিতে ও নিতে। ভদ্রলোক ওখানকার কলেজের প্রিন্‌সিপাল। আর আমি ভ্রাম্যমান ভ্যাকেশন জজ্।

"সে কী! আপনি খেয়ে যাবেন না?" বললেন ভদ্রমহিলা। "আপনার জন্যে সমস্ত তৈরি।"

আশ্চর্য হয়ে বললুম, "কিন্তু ওদিকে সারকিট হাউসে—"

"আমি আগে থাকতে বারণ করে পাঠিয়েছি।"

শুধু তাই নয়। ইতিমধ্যে তিনি আমার হাঁড়ির খবর বার

করেছিলেন। আমি যে নিরামিষ খাই তাও তাঁর অজানা নয়। আমার কোনো অজুহাত খাটল না। বসতেই হলো আবার।

খাবার টেবিলে দেখলুম ভদ্রলোক খোশগল্পের রাজা। মন্‌গোমরী কী বলেছিলেন চার্চিলকে। চার্চিল কী বলেছিলেন তার উত্তরে। এসব তো শুনতে হলোই, তার উপর শুনতে হলো স্টালিন কেমন হারিয়ে দিয়েছিলেন চার্চিলকে ভোজনপ্রতিযোগিতায়। সে ভারী মজার কথা। তাঁর মতো রসিয়ে রসিয়ে বলতে পারব না তো, গল্পটা মাটি করব। থাক, বলব না।

আহারান্তে অমনি চলে যেতে নেই, একটু দেরি করতে হয়। বসবার ঘরের এক প্রান্তে বিশাল বুকশেল্‌ফ্‌ ছিল। সেখানে গিয়ে বইপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। ইংরেজী ও ফরাসী বই বেশীর ভাগ। কত কালের পুরোনো বই। আজকাল সে-সব বই দেখাও যায় না। দেখতে দেখতে একখানা বইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা ল্যাভেণ্ডারের পল্লব। শুকিয়ে মুড়মুড়ে হয়ে গেছে। হাত দিলে গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যাবে।

ভদ্রলোক আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমার হাতে ল্যাভেণ্ডারের পল্লব পড়তে যাচ্ছে দেখে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। অপ্রস্তুত হয়ে নামিয়ে রাখলুম বইটা। অমনি তিনি ওখানা সরিয়ে রাখলেন একেবারে নাগালের বাইরে। একটা টুলের সাহায্যে।

হঠাৎ তাঁর এই ব্যবহারে আমি হতভম্ব হয়েছিলুম। তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আমার দুটি হাত ধরে মাফ চাইলেন। তখন তাঁর দুই চোখের চাউনি যা হলো তা চিরদিন আমার মনে থাকবে। কী যে করুণ আর কাতর আর ত্রসিত! আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন,

"আপনি এখনো যুবক। দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে আপনার সামনে। আর আমি বিগতযৌবন। আমার জীবনও তো শেষ হয়ে এলো।"

কেন ও কথা বললেন ভাবছি। তিনি বলতে লাগলেন, "আমার জীবনে যা গেছে তা গেছে, তা আর ফিরে আসবে না। ওই যে ল্যাভেণ্ডার ও যদি ধূলো হয়ে ধূলোর সঙ্গে মিশে যায় তা হলে আর এ-জীবনে ল্যাভেণ্ডার উপহার পাব না।"

এবার মার্জনা চাইবার পালা আমার। বললুম, "আমাকে ক্ষমা করবেন। বুঝতে পারিনি। না বুঝে অপরাধ করেছি।"

"না, না, অপরাধ কিসের! বলতে গেলে আমারই অপরাধ, আমি ওটা অতিথির হাত থেকে কেড়ে নিয়েছি। ক্ষমা করবেন তো!" রুদ্ধ কণ্ঠে আবেদন করলেন।

আমি তাঁর স্ত্রীর কাছে বিদায় নিতে গেলুম। ভদ্রমহিলা কফি তৈরি করছিলেন। শুনতে পাননি আমাদের কথাবার্তা। তাঁর হাত থেকে কফির পেয়ালা নিয়ে দু'এক চুমুক দিয়ে শুভরাত্রি জানালুম। তাঁকে ও তাঁর কন্যাদের। ভদ্রলোকের দিকে ফিরতেই তিনি বললেন, "চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই।"

এগিয়ে দিতে গিয়ে তিনি আমার সঙ্গে সারকিট হাউস পর্যন্ত হাঁটলেন। বেশী দূর নয়, তা হলেও প্রত্যাশার বাইরে। সারকিট হাউসে পৌঁছে আমি বললুম, "বেয়াদবি মাফ করবেন। সারা সন্ধ্যা মনে হচ্ছিল আপনার মতো সুখী কে! কিন্তু সেই ল্যাভেণ্ডারের ঘটনাটার পর অন্য রকম মনে হচ্ছে। ওটা না ঘটলেই ভালো হতো।"

তিনি একটু বিশ্রাম করবেন বলে বসলেন। ধীরে ধীরে বললেন, "সুখ অনেক রকম আছে। এক রকম সুখ আজ আপনি দেখলেন।

সত্যি তার মতো সুখ নেই। কিন্তু সেও তার মতো নয়। সেই ল্যাভেণ্ডার উপহার পাওয়ার মতো।"

আমি তাঁকে একটু উস্কে দিলুম। তিনি বললেন, "শুনবেন নাকি ও কথা?"

বললুম, "আপনার যদি আপত্তি না থাকে।"

তিনি এক গ্লাস জল চেয়ে নিলেন। জল রইল তাঁর হাতের কাছে। মাঝে মাঝে গলা ভিজিয়ে নেন আর গল্প বলেন।

২

দু'চোখ বুজে দুই চোখের উপর দুই হাত রেখে টেবিলের উপর কনুই ভর দিয়ে বসলে প্রথমটা সব অন্ধকার দেখায়। তার পরে ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে ফুটে ওঠে সাঁঝের শুকতারা। সাঁঝের শুকতারার মতো শুভ্র সুন্দর একখানি মুখ। শুভ্র সুন্দর শুচি। অন্ধকারে ঐ একটি মাত্র তারা।

তার সঙ্গে আমার দেখা হয় পঁচিশ বছর আগে। লণ্ডনে তখনকার দিনে আমাদের বাঙালী সমাজের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল বেলসাইজ পার্কে মিস্টার ও মিসেস তরফদারের বাড়ী। প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায় তাঁরা রিসিভ করতেন। সকলে অবশ্য সব শনিবার যেত না। কিন্তু অন্য কোথাও এনগেজমেণ্ট না থাকলে আমি অন্তত আধ-ঘণ্টার জন্যে হাজিরা দিয়ে আসতুম।

এমনি এক সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আমার দেখা। মিস তরফদারের বান্ধবী বলে তার পরিচয়। শুনলুম বেডফোর্ড কলেজে পড়ে। শনিবারটা প্রায়ই তরফদারদের সঙ্গে কাটায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা

অবধি তার মেয়াদ। সাধারণত ছ'টার মধ্যে ফিরে যায়। কিন্তু সেদিন কী জানি কেন আটটা পর্যন্ত আটকা পড়েছিল।

আমি উঠছি দেখে মিসেস তরফদার বললেন "বরুণ, তোমাকে একটা কাজ দিতে পারি? কিছু মনে করবে না তো?"

"কাজ দেবেন, সে তো আমার সৌভাগ্য, মাসিমা। কিছু মনে করব কেন?"

"তা হলে শোন। এই যে পূরবী দেখছ একে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। আজ এর খুব দেরি হয়ে গেছে। তুমি যদি দয়া করে পৌঁছে দাও তো—"

"চিরকৃতজ্ঞ হবেন তো? আচ্ছা, আমি এই সুখকর কর্তব্য স্বীকার করছি।"

সেখানে আরো কয়েক জন গ্যালাণ্ট যুবা ছিল। তারা কেবল ফষ্টি-নষ্টি করতে জানে, কিন্তু হাতের তাস ফেলে একজনও উঠবে না। বসে বসে দু'কথা শুনিয়ে দিল আমাকে। আমি তাদের কথায় কান না দিয়ে পূরবীকে তার ফারকোট গায়ে দিতে সাহায্য করলুম ও বাইরে যাবার জন্যে দরজা খুলে ধরলুম।

সেদিন বেশ বৃষ্টি পড়ছিল মনে আছে। ছাতা ছিল আমার সঙ্গে। তুলে ধরলুম ওর মাথায়। ওর ছাতা ও সঙ্গে আনতে ভুলে গেছল। ফিরে গিয়ে নিয়ে আসবার মতো সময় ছিল না। বেলসাইজ পার্ক টিউব স্টেশনে ওকে ট্রেন ধরতে হবে।

স্টেশনে পৌঁছে পূরবী বলল, "আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। এটুকুরও দরকার ছিল না। তবে আপনি এই দিকে আসছিলেন বলে মাসিমা আপনাকে এ কাজ দেন। তাঁর মতে লণ্ডনের রাস্তায়

বিদেশিনী মেয়েদের একা চলাফেরা করতে দেওয়া উচিত নয় এত রাত্রে।”

আমি বললুম, “মাসিমার সাংসারিক অভিজ্ঞতা আপনার চেয়ে বেশী।”

সেদিন আমি ওকে বেডফোর্ড কলেজ পর্যন্ত পৌছে দিলুম। পথে ওর সঙ্গে কত রকম কথাবার্তা হলো। ভারী ভালো লাগল ওর সঙ্গ, ওর স্বভাব। আমার ধারণা ছিল আমাদের দেশের সুন্দর মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়, বিয়ে যাদের হয় না তারাই বেশী লেখাপড়া করে ও তাদের কেউ কেউ বিলেত পর্যন্ত আসে। কিন্তু পূরবীকে দেখে আমার সে ধারণা বদলে গেল। সে ডানাকাটা পরী না হলেও তার রূপ দু'দণ্ড চেয়ে দেখবার মতো।

সেদিন বাসায় ফিরে গিয়ে সারা রাত তার কথা ভেবেছি ও তাকে স্বপ্ন দেখেছি। মনে হয়েছে তার সঙ্গে আমার আলাপ একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। আছে এর পিছনে গ্রহতারার চক্রান্ত। নইলে কেনই বা সে আটটা অবধি আটকা পড়বে, এত লোক থাকতে আমাকেই বা কেন তার পার্শ্বরক্ষী হতে হবে? অদৃষ্ট আমাদের দু'জনকে একসূত্রে গাঁথতে চায়। তা ছাড়া আর কী এর ব্যাখ্যা!

পরের শনিবারের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে কেমন করে যে সাত সাতটা দিন পার করে দিলুম তার হিসেব নেই। একটু সকাল সকাল গিয়ে দেখি যাবার জন্যে পূরবী তৈরি হয়ে বসে আছে। মাসিমা বললেন, বরুণ, তোমার কথাই হচ্ছিল। কিন্তু আজ আর তোমাকে কষ্ট দেব না। তুমি অনেক দূর থেকে এসেছো, একটু বিশ্রাম [illegible] একটু কিছু খাও। জিতেন সঙ্গে যাক পূরবীর।”
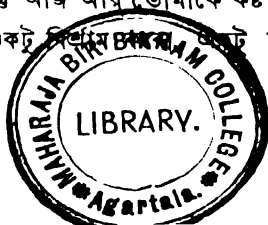
"না, মাসিমা, কাউকে যেতে হবে না আমার সঙ্গে। এই তো সবে ছ'টা বাজল।" পূরবী একাই যেতে উদ্যত।

এক খাব্‌লা চীনে বাদাম মুখে পুরে এক রাশ চকোলেট পকেটে ভরে হাঁউমাউ করে আমি বললুম, "আমার খাওয়া হয়েছে, মাসিমা। আমিই যাচ্ছি এর সঙ্গে।"

জিতেন তো আমার দশা দেখে হেসে ফেলল। রুমাল দিয়ে আমার দুটো হাত বেঁধে বলল, "চলো, তোমাকে পুলিশে দিয়ে আসি বমাল সমেত।"

মাসিমা বললেন, "বমাল মানে কি চকোলেট না—" পূরবীর দিকে ইঙ্গিত করলেন।

কয়েক শনিবার পরে পূরবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আর পাঁচ জনে মেনে নিল। পূরবী আমার গার্ল, আমি তার beau ; আমাদের বিয়ে হবে একদিন-না-একদিন। উৎসাহ এলো মাসিমার কাছ থেকে। কিন্তু পূরবী এ বিষয়ে নীরব। সে কিন্তু আমার সঙ্গেই মেশে সব চেয়ে বেশী, আমার সঙ্গে থিয়েটারে যায়, বাসের উপর তলায় বসে শহর বেড়িয়ে আসে। অথচ আমার সঙ্গে এমন একটা দূরত্ব রেখে চলে যে আমি অবাক হয়ে যাই তার ব্যবহার দেখে। আর পাঁচ জনে আমাকে মনে মনে হিংসা করছে, কিন্তু আমি কি তাদের হিংসার যোগ্য!

ভেবেছিলুম পূরবীকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করব, আমার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট সম্বন্ধে তার কী মত। কিন্তু কিছুতেই ও কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোলো না। শেষে একখানা চিঠি লিখে সাত পাঁচ ভেবে ডাকে দিলুম।

জীবনে সেই আমার প্রথম প্রেমপত্র। তাতে ওকে কী বলে সম্বোধন

করেছিলুম, শুনবেন? এঞ্জেল বলে। বলা বাহুল্য চিঠিখানা ইংরেজীতে লেখা।

পূরবী তার উত্তরই দিল না।

পরে যেদিন দেখা হলো জানতে চেয়েছিলুম চিঠিখানা ওর হাতে পড়েছে কি না। ওর মুখখানা আরক্ত না হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল, "তুমি কি জানতে না যে আমি হস্‌টেলে থাকি? আর কখনো অমন কাজ কোরো না।"

প্রথম পত্রের এই পরিণামের পর দ্বিতীয় পত্র লিখতে আমার সাহস হয়নি। কাজ কী এনগেজমেন্টের প্রসঙ্গ তুলে? বাক্যে না হোক, কাযে কি আমরা এনগেজ্‌ড নয়? পূরবী আমাকে বাক্য দেয়নি, আমিও দিইনি তাকে। কিন্তু আমরা তো পরস্পরের মন বুঝি। তবে আর কী? লোকটা আমি কৃত্রিমতার পক্ষপাতী নই।

এনগেজ্‌ড না হয়েই আমরা এনগেজ্‌ড বলে বন্ধুমহলে গৃহীত হলুম। তবে নিজেদের কাছে ঠিক এনগেজ্‌ডের অধিকার পেলুম না। চুম্বন করতে গিয়ে অদৃশ্য বাধা বোধ করেছি। এঞ্জেলকে চুম্বন করতে সাহস হয়নি। যদি সে কিছু মনে করে। যদি বলে, "আমি কি এতই সুলভ? আমাকে তুমি কী পেয়েছ?"

আপনাকে খুলে বলতে দোষ নেই। আমাদের ভালোবাসা সম্পূর্ণ প্লেটোনিক। তা বলে কম সত্য বা কম গভীর নয়। তাকে না দেখতে পেলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যেত। দেখা হলে প্রাণ ফিরে আসত। তার চোখে মুখে যা লক্ষ্য করেছি তা আমার সঙ্গ পেয়ে সহজ আনন্দ। সে আর কারো দিকে ফিরেও তাকাত না। আমার চোখে চোখ পড়লে তার চোখের তারা জ্বলে উঠত। অনেক সময় ভেবেছি এ কি প্রেম, না

এক প্রকার বন্ধুতা ? কিন্তু পরীক্ষায় ফেলে দেখেছি প্রেমই বটে। একবার বেলসাইজ পার্কে যাইনি। সে ছুটে এসেছিল হাইগেটে আমার বাসায় আমার খোঁজ নিতে।

তখনকার দিনে মেলামেশা অত অবাধ ছিল না। সেইজন্যে আমার বাসায় তার ছুটে আসা বলতে কতখানি ত্যাগস্বীকার ও বিপদবরণ বোঝায়, তা একালের ছেলেমেয়ের কল্পনার অতীত। আমার ল্যাণ্ডলেডী তো স্তম্ভিত। পরে আমাকে বলেছিল, "মেয়েটি দেখছি মরিয়ার মতো প্রেমে পড়েছে তোমার। আহা ! কী মধুর মেয়েটি !"

ও আমার জন্যে একটা স্কার্ফ বুনে উপহার দিয়েছিল, সেটা ল্যাণ্ডলেডীর নজর এড়ায়নি। বুড়ী বলল, "এর মতো উপহার তোমার কী আছে দেবার ? বাজার থেকে কিনে দিতে যে কোনো লোক পারে।"

বললুম, "আমি তো বুনতে জানিনে। আঁকতেও জানিনে ছাই। আমি আর কী দিতে পারি ?"

বুড়ী বলল, "তুমি তো বেশ রাঁধতে পারো দেখি। রেঁধে খাওয়াও না কেন ওকে ?"

চমৎকার আইডিয়া। পরের শনিবার নিমন্ত্রণ করলুম পূরবীকে। সে খুশি হয়ে এলো। এখন থেকে প্রায় শনিবার ওর নিমন্ত্রণ আমার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনের। তার পরে মাসিমার ওখানে। রান্নাটা অবশ্য একতরফা নয়। সেও যোগ দিত। কী যে আনন্দ পেয়েছি সেই কয়েক মাস ! যতই ওঁর সঙ্গে মিশতে পাই, ততই বুঝতে পারি ওর সঙ্গে যদি বিয়ে হয় তবে সারা জীবনটা কেটে যাবে কয়েকটা মাসের মতো।

পূরবী কিন্তু বিয়ের কথা ভুলেও মুখে আনে না। কথা উঠলে এড়িয়ে যায়। আমি যদি বলি, আমাদের দু'জনের এই আনন্দকে জীবনব্যাপী

করতে হলে বিয়ে না করে উপায় কী, সে বলে, আচ্ছা বিয়ে-পাগলা বুড়ো যা হোক।

কিছুদিন পরীক্ষা নিয়ে মহা ব্যস্ত ছিলুম। দেখা হয়নি। পরীক্ষার পরে তরফদার মাসিমা বললেন, "এবার তো দেশে ফেরার সময় হয়ে এলো তোমার। তার আগে একটু ঘোরাঘুরি করবে না?"

আমিও সেই কথা ভাবছিলুম। কন্টিনেণ্টে ঘুরতে চাই। কিন্তু পূরবী কি যেতে রাজী হবে? সে না গেলে আমি কী করে যাই? তার কাছাকাছি থাকতে হবে যে। পূরবীর পড়া আরো এক বছর বাকী। সে আপাতত দেশে ফিরছে না। একা ফিরতে হবে আমাকেই। সেইজন্যে এই দুটি মাস তার কাছাকাছি থাকা এত জরুরি। কন্টিনেণ্টে বেড়ানো অবশ্য আমার অনেক দিনের শখ। কিন্তু দুটোর মধ্যে একটা যদি বেছে নিতে হয় তবে পূরবীর কাছাকাছি থাকা আরো জরুরি।

পূরবীর কানে গেল এ কথা। সে বলল, "বুড়ো, এ তোমার নতুন এক পাগলামি। আবার কবে এ দেশে আসবে! হয়তো এ জীবনে নয়। এ সুযোগ হাতছাড়া করলে পশ্তাবে। যাও, কন্টিনেণ্ট দেখে নাও।"

ভয়ে ভয়ে বললুম, "তুমি যাও তো আমি যাই।"

সে হাসল। "পড়োনি রবি ঠাকুর কী লিখেছেন? পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নহিলে খরচ বাড়ে।"

পড়েছি। সত্যি, গুরুদেব যদি আর কিছু না লিখে শুধু ঐ একটি পংক্তি লিখে থাকতেন তা হলেও তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত হতো। ঐ একটি উক্তির দাম লাখ টাকা। আমার পকেট তখন গড়ের মাঠ। ধারকর্জ করে কোনো মতে একজনের কন্টিনেণ্ট বেড়ানো চলে। দু'জনের জন্যে কার কাছে হাত পাতি?

ও যে আমাকে পতি বলে স্বীকার করে নিল এর জন্যে আমার আনন্দের সীমা রইল না। ওর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে দেখলুম আনন্দটা পারস্পরিক।

বললুম, "পতির পুণ্যে কাজ নেই। আমি যাব না। শেষ দুটো মাস সতীর কাছাকাছি কাটাব।"

তার দৃষ্টির দীপ থরথর করে কাঁপল। সে বলল, "আমি যাচ্ছি মেরিয়নের সঙ্গে পাড়াগাঁয়ে থাকতে। তার অতিথি হয়ে। তুমি থাকবে কোথায়?"

তাই তো। আমি থাকব কোথায়? আর থাকতে ভালো লাগবে কেন পাড়াগাঁয়ে পাক্কা দু'মাস? ও মেয়েরাই পারে। আমরা পুরুষ, আমরা সুদূরের পিয়াসী।

চললুম কন্টিনেণ্ট বেড়াতে। একা একা ভালো লাগে না, দল জুটিয়ে নিলুম। হৈ হৈ করে আমরা কয়েকজন যুবক আজ এখানে যাই, কাল ওখানে যাই, খরচ বাঁচানোর জন্যে ট্রেনে রাত কাটাই, কিংবা সরাইখানায়, কিংবা হস্‌পিসে। এই জন্যেই বলে পথি নারী বিবর্জিতা। পূরবীকে সঙ্গে আনলে অর্ধেক ফুর্তি বাদ পড়ত, জীবনটা সেই পরিমাপে নীরস হতো। কোথায় ক্যাফে, কোথায় কাবারে, কোথায় চোরডাকাতের আস্তানা। আমি ও আমার থ্রী মাস্‌কেটীয়ার্স মিলে কত বার বিপদের সন্ধানে গেছি, সামনে পড়েছি। দৈবাৎ রক্ষা পেয়েছি। সে ছিল বটে একটা বয়স। সে-সব দিন আর ফিরবে না।

ফ্রান্স থেকে জার্মানী, জার্মানী থেকে অস্‌ট্রিয়া, অস্‌ট্রিয়া থেকে সুইটজারল্যাণ্ড, সুইটজারল্যাণ্ড থেকে ইটালী, ইটালী থেকে আবার

ফ্রান্স হয়ে ইংলণ্ড। পূরবীর জন্যেই ইংলণ্ডে ফেরা, নইলে কোনো দরকার ছিল না।

বিদায় নিতে গেলুম ইস্টবোর্নে। সেখানে সে তরফদারদের অতিথি। আমাকে দেখে তার দৃষ্টিপ্রদীপ উজ্জ্বল হলো। বলল, "খুব উপভোগ করলে?"

সত্যি খুব উপভোগ করেছিলুম, কিন্তু সত্য গোপন করাই বোধ হয় সুবুদ্ধি। বললুম, "কই আর উপভোগ করলুম! তুমি ছিলে না।"

সে হেসে বলল, "কথাটা পতির মতোই হলো। আদর্শ পতির।"

ধরা পড়ে গেলুম। সাফাই মুখে জোগাল না। বললুম, "তুমি কিন্তু শুকিয়ে গেছ।"

সে ঈষৎ কুপিত হয়ে বলল, "বরুণ, থাক। পতিগিরি যথেষ্ট হয়েছে।"

সমুদ্রের ধারে বসে দু'জনে দু'জনকে হৃদয় খুলে দেখিয়েছিলুম সেই এক দিন। গোধূলি যেন ফুরোতে চায় না। শরৎ গোধূলি।

বললুম, "পূরবী, তোমার উপরে নির্ভর করছে আমার জীবনের সুখ সার্থকতা। তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করো তা হলে যে আমি বাঁচব না তা নয়, কিন্তু জীবনে আমার সুধা থাকবে না। সুধার বদলে থাকবে সুরা। হৈচৈ, উত্তেজনা, নিজেকে মাতিয়ে রাখা, তোমাকে ভুলে থাকা। যে ভাবে এই দু'মাস কাটল।"

সে অনেকক্ষণ নীরব থাকল। তার পর ক্ষীণ স্বরে বলল, "তুমি বিয়ে করোনি, বিয়ের ভিতর দিয়ে যাওনি, তাই বিয়ে তোমার কাছে একটা সুখস্বপ্ন। আমার কাছেও এক দিন সুখস্বপ্ন ছিল। এখন কিন্তু দুঃস্বপ্ন।"

আমি চমকে উঠলুম। এ কী শুনছি! তা হলে কি সে বিবাহিতা!

"হাঁ, যা ভেবেছ। এত দিন তোমাকে বলিনি। বলার সময় আসেনি। আজ না বললে নয়। আমাকে বিয়ে করতে হয়েছে, বিয়ের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। চাও তো সব খুলে বলতে পারি, কিন্তু কী হবে ইল্লং ঘেঁটে! জেনে নাও যে আমার সুখস্বপ্ন ভেঙে গেছে। যা দেখেছি তার থেকে আমার এই প্রতীতি হয়েছে যে বিয়ের পরে মানুষের পতন হয়। দু'বছর পরে এক দিন হিসাবনিকাশ করে দেখলুম আমি ছোট হয়ে গেছি, আমার স্বামী আমার চেয়েও ছোট। তাঁর কাছ থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে এলুম এ দেশে। কিছু স্ত্রীধন ছিল। পড়াশুনা করছি, পাশ করলে চাকরি পাব আশা করি। স্বামীকে অনুমতি দিয়ে এসেছি আবার বিয়ে করতে। তিনি করেছেনও।"

হতবাক হয়ে শুনছিলুম। এ কি সত্য, না আমাকে ভোলাবার জন্যে স্তোকবাক্য! সোজা বললেই পারে আমাকে বিয়ে করতে তার ইচ্ছা নেই, আমি তার অযোগ্য। কিন্তু এসব বানিয়ে বলা কেন? আমার চোখে ধুলো দেওয়া কি অত সহজ?

"বিয়ে করে থাকলে তোমার নাম হতো মিসেস অমুক। কিন্তু তা তো নয়। মিস চৌধুরী তোমার নাম।"

"সেটা আমার কুমারী অবস্থার নাম। ইউনিভার্সিটির কাগজপত্রে সেই নাম ছিল। এখানে নাম লেখাবার সময় কাগজপত্র বদলাইনি। সহপাঠিনীরা জানে আমি মিস চৌধুরী। মণিকা সেই নাম তার বাড়িতে প্রচার করে দিয়েছে। সকলে সেই নামে ডাকে। সিঁথিতে সিঁদুর

দিয়ে তার প্রতিবাদ করিনি। কেনই বা করব? বিয়ে তো আমার চুকে গেছে। আমি তো আর বিবাহিতা নই।"

কান্না আমার বুকে আছাড় খাচ্ছিল। আর একটু হলে চোখের বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। একরাশ বিদেশীর সুমুখে কান্নায় গলে যাব, আমি কি এতই নরম!

মূকের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম তার মুখে। সে বলতে লাগল, "আমি তোমাকে ঠকাতে চাইনি, ঠকাইনি। তুমি আমাকে ভালোবাসো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমাদের ভালোবাসা আমাদের উন্নত করেছে। হিসাবনিকাশ করলে দেখবে তুমি ও আমি কেউ কাউকে ছোট করিনি, ছোট হইনি। দু'জনেরই উচ্চতা বেড়ে গেছে।"

আমি তা স্বীকার করলুম। কিন্তু আমার আকাশজোড়া কেল্লা যে ধ্বসে গেল। একটা দিনের একটা মুখের কথায় এত বড় পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি হবে! এটা কেমন করে মেনে নিই! ক্ষোভ আর অভিমান আমাকে বিদ্রোহী করেছিল।

"তুমি যদি চাও," সে তার অমিয়মাখা সুরে বলতে লাগল, "তবে আমাদের এখনকার এই সম্বন্ধ চিরদিনের হতে পারে। আমিও বিয়ে করব না, তুমিও বিয়ে করবে না। এই ইংলণ্ডেই কাজকর্ম খুঁজে নেব দু'জনে। এমনি কাছাকাছি থাকব। এমনি ভালোবাসব। এর চেয়ে মধুর সম্বন্ধ আর কী হতে পারে! কিন্তু আমি তোমাকে বলব না একে চিরন্তন করতে। আমি জানি তুমি সুখস্বপ্ন দেখছ। আমাকে ঘিরে ততটা নয় বিয়েকে ঘিরে যতটা। যাও তবে, বিয়ে করো একটি মনের মতো মেয়ে। সুখী হও। আমার অন্তরের প্রার্থনা তুমি সুখী হও।"

এর পরে আমাদের বিদায়। বিদায়ের দিন সে আমাকে একখানি বই উপহার দেয়, কবিতার বই, ক্রিস্টিনা রোজেটির। তাতে গোঁজা ছিল একটি ল্যাভেণ্ডারের পল্লব।

৩

গল্প শেষ হয়ে গেছে, বুঝতে পারিনি। জানতে চাইলুম, "তার পরে?"

"তার পরে?" ভদ্রলোক কী বলবেন খুঁজে পেলেন না। "তার পরে আমি সুখী হলুম, সফল হলুম। দেখছেন তো কেমন সুখী পরিবার আমার? চাকরিটাও সুখের চাকরি। দেদার বই কিনি আর পড়ি। গান শুনি আর করি। ছেলেরা মাঝে মাঝে দিক করে। ধর্মঘটের ভয় দেখায়। আমিও ভয় দেখাই ইস্তফার। আমার দিন তো প্রায় হয়ে এলো। সামনের বছর রিটায়ার করছি। কোথায় বসব, বলতে পারেন? কলকাতায় যা ভিড়।"

রাত হয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে ভদ্র-মহিলা নিশ্চয় ঘনঘন ঘড়ি দেখছেন। শুধু একটি জিজ্ঞাসা ছিল। পূরবী দেবীর কী হলো?

"বিলেতেই রয়ে গেল। এখনো সেইখানেই আছে। বড় দিনের সময় কার্ড পাঠাই, কার্ড পাই।"

(১৯৫২)

বান্ধবী

ভদ্রমহিলাকে কানু আগে কখনো দেখেনি। বাড়ীতে পা দিয়ে লক্ষ করল তিনি রমলার সঙ্গে বসে গল্প করছেন। মনে হলো গৃহিণীর কোনো বান্ধবী। আপিস থেকে ফিরেছে, তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে অন্য ঘরে গেল পোশাক ছাড়তে। পোশাক ছেড়ে স্নানের ঘরে যাবে, জায়া এসে বললেন, "কই, তুমি আসছ না যে ? কতক্ষণ ওঁকে বসিয়ে রাখব ?"

কানু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "তোমার বান্ধবীর আমার সঙ্গে কী দরকার ?"

"আমার বান্ধবী !" গৃহদেবী ভুরু কুঁচকিয়ে বললেন, "আমি তো জানতুম তোমার বান্ধবী এক ঘণ্টা হলো বসে আছেন কখন তুমি আপিস থেকে ফিরবে বলে। চা দিলে খাবেন না তোমার সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাবেন বলে। ধন্য তোমার বান্ধবীভাগ্য। মুগ্ধ হয়ে টেলিফোনে ডাকলুম। ওমা, আপিসেও তোমার বান্ধবী। বামাকণ্ঠে উত্তর এলো, উনি তো রওনা হয়ে গেছেন। তা তোমার এত দেরি হলো কেন ? পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে জ্যাম হয়েছিল ?"

'তোমার বান্ধবী' শুনে কানু ততক্ষণে অন্যমনস্ক হয়েছিল। কে এই মধ্যবয়সিনী ? বাল্যে বা কৈশোরে বা প্রথম যৌবনে কবে এঁর সঙ্গে পরিচয় ? স্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়ে কানু মগ্ন প্রতিমার তল্লাস করল। কোথাও কোনো হদিস পেলো না। পর পর কয়েকটি মুখ ভেসে উঠল। কিন্তু কারো সঙ্গে এ মুখের আদল নেই।

"আমার বান্ধবী !" সে বিমূঢ় ভাবে বলল। "বাড়ী ভুল করেন নি তো ? আমার নামটা বলতে পারেন তো ?"

"তোমার নাম," সহধর্মিণী ফিক করে হেসে বললেন, "এত ভালো করে জানেন যে মিঃ বিশ্বাস বলতে হয় না, কানাইবাবু বলতে হয় না, সোজাসুজি কানুদা। আহা, কী মিষ্টি শোনায়! আমি তোমার স্ত্রী হয়েছি বলে কি তোমাকে কানু বলে ডাকতে পারব না? বলি, ও কানুদা, তোমার বোনটি যে তাঁর নিজের নাম কিছুতেই বলবেন না।"

রহস্য ক্রমে ঘোরালো হয়ে উঠল। ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতো। কে এই নীলবসনা সুন্দরী! আলুলায়িত কুন্তলা। চকিত নয়না। দীর্ঘাঙ্গী। গৌরবর্ণা।

কানুকে প্রতিনমস্কার করে ভদ্রমহিলা বললেন, "দাদা বোধ হয় চিনতে পারছেন না। চিনবেন কী করে? দেখা তো হয়নি। সেবার চিঠি লিখেছিলুম দিনাজপুরে। লিখেছিলুম, দাদার সঙ্গে দিন সাতেক থাকতে চাই। বহু কালের সাধ। দাদা তার উত্তরে লিখলেন, তা হতে পারে না। কেন হতে পারে না, তা তো লিখলেন না। ভাবলুম ওটা বাজে ওজর। গেলুম সেই দিনাজপুরে। গিয়ে দেখি দাদা নেই। দাদা বদলি হয়েছেন ঢাকায় না কোথায়। সে কী দুর্ভোগ! দাদার বন্ধু দত্তগুপ্ত যদি দয়া না করতেন আমাকে সে দিন গাছতলায় রাত কাটাতে হতো।"

এই বার কানুর স্মরণ হলো এক ভদ্রমহিলা তাকে অমন একখানা চিঠি লিখেছিলেন বটে চার পাঁচ বছর আগে। লিখেছিলেন তিনি থাকতে চান সাত আট দিন তার সঙ্গে। বোধ হয় জানতেন না যে তার গৃহে গৃহিণী বলে একটি অবান্তর সামগ্রী আছে, কিংবা জানলেও মানতেন না যে গৃহিণীর আপত্তি বলে একটা বাজে ওজর থাকতে পারে, কিংবা মানলেও ধরে নিয়েছিলেন যে কর্তাকে দাদা বলে ডাকলেই গৃহিণী গলে জল হয়ে যান।

ইনিই তবে সেই পত্রালাপিনী। ঘটনাটা সহধর্মিণীরও মনে গাঁথা ছিল। তিনি "দাদা"র দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে অধরে ঈষৎ বক্র হাসি ফুটিয়ে স্মরণশক্তির সাক্ষ্য দিলেন। দু'জনেরই খেয়াল হলো যে দাদারও দাদা আছে। ইনি সেই অগ্রজপ্রতিমের বান্ধবী। সতেরো আঠারো বছর আগে সুপর্ণদা একবার এঁর কথা বলেছিলেন, দু'একখানা চিঠিও দেখিয়েছিলেন এঁর হাতের লেখা। তার এক যুগ পরে হঠাৎ একদিন ইনি দিনাজপুরে এসে বাস করবেন বলে চিঠি লেখেন।

হাঁ, বান্ধবীই বটে। কিন্তু স্বামীরও নয়, স্ত্রীরও নয়। কানুর বন্ধু সুপর্ণ চক্রবর্তীর। রমলার বক্রহাসি ধীরে ধীরে সরল হাসিতে রূপান্তরিত হলো। সে বলতে যাচ্ছিল, "ও! সুরেখাদি! আপনি!" কিন্তু এতক্ষণ বাদে চিনতে পারা তো গৌরবের কথা নয়।

চা খেতে খেতে কানু বলল, "কেমন করে জানব যে আপনি আমার বদলির পরে আসবেন! জানলে অবশ্য আপনার জন্যে আরো ভালো ব্যবস্থা করে যেতুম। দিনাজপুরের রাজবাড়ীতে উঠতেন।"

"তার প্রয়োজন হতো না, দাদা। আপনি বদলি হয়েছেন জানলে আমি দিনাজপুরে না গিয়ে ঢাকায় যেতুম।" ভদ্রমহিলা বেশ জোর দিয়ে বললেন।

সে আশঙ্কা যে কানুর মনে দেখা দেয়নি তা নয়। ঢাকায় গিয়ে তার বরাবর ভয় ছিল কে জানে কোন দিন সুরেখা দেবী আবির্ভূতা হবেন। সত্যি কথা বলতে কি, দিনাজপুর ছাড়ার এক দিন আগে সে সুরেখার শেষ চিঠি পেয়েছিল। জবাব দিতে সময় পায়নি সে কথা ঠিক, কিন্তু এ কথাও বেঠিক নয় যে ঢাকায় বদলির খবর দিলে তিনি হয়তো দিনাজপুরের টিকিট না কেটে ঢাকার টিকিট কাটতেন। দিনাজপুর ভ্রমণ তাঁর লক্ষ্য ছিল না।

তিনি ঢাকায় যেতেন শুনে রমলা বলল, "ঢাকায় না গিয়ে ভালোই করেছেন, সুরেখাদি। দেড় মাস আমি শয্যাগত ছিলুম খুকুর জন্মের পরে। এত কষ্ট কোনো বার পাই নি।"

সুরেখার মুখে একটু 'আহা' শব্দ শোনা গেল না। আপনাকে নিয়ে তিনি বিভোর। তাঁর বয়স নাকি দিদি ডাকের উপযোগী নয়। তিনিই বয়সে ছোট। তবে যদি তাঁকে সুরেখা বলে ডাকতে সঙ্কোচ বোধ হয় তা হলে তাঁর স্বামীর পদবী ধরে ডাকতে পারা যায়—মিসেস মহালদার। তাঁর স্বামীর নাম—

এই বলে তিনি এমন একজনের নাম করলেন যে কানু ও রমলা দু'জনে দু'জনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তাদের কান খারাপ না তাঁরই মাথা খারাপ!

"আপনারা ভাবছেন আমি কেমন করে মিসেস মহালদার হলুম। মিসেস মহালদার তো আরেক জন আছেন এবং তিনি এখনো বেঁচে।"

"তা ছাড়া সুপর্ণ তো কোনো দিন ও কথা বলেনি বা লেখেনি।"

সুপর্ণর নাম শুনে তিনি জ্বলে উঠলেন। যাকে বলে তেলে বেগুনে। ভুলে গেলেন সুপর্ণকে বাদ দিলে কোন সুবাদে তিনি কানু বা রমলার সঙ্গে ভাব করবেন।

"সুপর্ণ! আপনার বন্ধু সুপর্ণ আমার যে ক্ষতি করেছে তেমন ক্ষতি কি মানুষে মানুষের করে! ও কথা থাক। ও কথা থাক।"

কানুর মুখ লাল হয়ে উঠল ও কথা কল্পনা করে। অস্ফুট স্বরে বলল, "অসম্ভব।"

"কী অসম্ভব! কিছুই অসম্ভব নয়।"

তা শুনে রমলা বলল, "সুপর্ণদাকে আমরা সাধুসন্ত বলেই জানি।"

"সাধুসন্ত! ওইখানেই তো আমার জ্বালা। তুমি সাধুসন্ত হয়েছ, বেশ করেছ। তা বলে আমি অবলা নারী, আমাকে ভজিয়ে সন্ন্যাসিনী করিয়ে তোমার কী লাভ হলো, বাপু? সন্ন্যাস কি সকলের সয়? মাঝখান থেকে গেল আমার চাকরিটা। দাদা, এসেছি আপনার কাছে একটি আর্জি নিয়ে। আপনার বন্ধুর কথায় আমি চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলুম। আপনি তার ক্ষতিপূরণ করুন। আমি জানি আপনি পারেন। আপনার হাতে অনেক ক্ষমতা। আমাকে একটি চাকরি জোগাড় করে দিতে হবে। আমি বেশী কিছু চাইনে। একজন মানুষের যাতে চলে। মানে আলাদা একটা ফ্ল্যাট। আলাদা এস্টাব্লিশমেণ্ট।"

যতই শুনছিল ততই অবাক হচ্ছিল কানু। ভদ্রমহিলা যে সুশিক্ষিতা—ইউরোপে শিক্ষিতা—এ সংবাদ সে রাখত। তিনি যে স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এ সমাচার তার কানে এসেছিল। কিন্তু এসব তো সে জানত না। চাকরি, চাকরিতে ইস্তফা, সন্ন্যাস, সন্ন্যাসে ইস্তফা, বিবাহ, বিবাহে ইস্তফা। তার পর আবার চাকরি।

"কিন্তু চাকরি কি আমার হাতে যে ইচ্ছা করলে দিতে পারি?" আফসোস জানালো কানু। "আমি কি মন্ত্রী না পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারী না দলের দাদা? কেরানীর চাকরি খালি হলেও আজকাল পূর্ব বঙ্গের উদ্বৃত্ত কর্মচারী পাঠায়। নতুন লোক নেবার জো নেই।"

সুরেখা দেবী অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, "অত কথা অমি বুঝিনে। এই আমলটাই আমার দুর্বোধ্য। ইংরেজ যখন ছিল তখন আমাকে এত ঘোরাঘুরি করতে হয়নি। ডি. পি. আই-র কাছে চিঠি লিখেছি। উত্তর পেয়েছি চাকরি তৈরি। আর এ কালে তো চিঠি লিখলে উত্তর

মেলে না, ফোন করলে শুনতে হয় 'এনগেজড'। দেখা করতে গেলে যদি বা দয়া করে দেখা দেন তবে ঐ বাঁধা গৎ। চাকরি কি আমার হাতে যে ইচ্ছা করলে দিতে পারি?"

অসহায় কানু রমলার দিকে তাকায়। রমলা বলে, "সুরেখাদি, তখনকার দিনে আপনার মতো উচ্চশিক্ষিতা ক'জন ছিলেন? এখন যে বাঙালীর মেয়েরা বিয়ের উপর ভরসা না রেখে লেখাপড়ার দিকে ঝুঁকেছে। প্রায়ই তো ফার্স্ট সেকেণ্ড হয় মেয়েরাই। এত চাকরি কোথায় যে ডি. পি. আই-কে লিখলেই পাওয়া যাবে? ইংরেজ থাকলে কি আজকের দিনে আপনার সুবিধা হতো?"

"হতো। হতো। নিশ্চয় হতো। ওদের মতো মানুষ আর হয় না। ওরাই মানুষ। হায়, হায়, কোথায় গেল ওসব সোনার মানুষরা! দেশ স্বাধীন হয়েছে না ছাই হয়েছে! উপায় থাকলে আবার গিয়ে ইংলণ্ডে বাস করতুম। ওরা মানুষ চেনে।"

এমন ইংরেজভক্তি ইংরেজ আমলেও দুর্লভ ছিল। কানু মনে মনে বিরক্ত হলো। ইংরেজ যেখানে গেছে এই ইংরেজভক্তরাও সেখানে গিয়ে কাশীবাস করুক।

এর পরে কখন এক সময় তিনি ব্যক্ত করলেন যে মহালদার তাঁকে যে বাড়ীখানায় থাকতে দিয়েছিলেন দাঙ্গার সময় সেখানা ছিল বিপদ্-জনক এলাকায়। তাই তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান মফঃস্বলে তাঁর মাতুলালয়ে। বছর দেড়েক পরে ফিরে এসে দেখেন উদ্বাস্তরা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তাঁর বাসায়। তাদের বেদখল করা মহালদারের অসাধ্য। তখন থেকে সুরেখাও বাস্তহারা। তাঁর স্বামী তাঁকে মাসে মাসে মাসোহারা দিয়ে থাকেন, কিন্তু বাড়ী কোথায় পাবেন!

কেন? মহালদারের বিরাট সৌধ ক্যামাক স্ট্রীটে। রোজ দু'বেলা ঐ পথ দিয়ে যাওয়া আসা করে কানু।

সেখানে মহালদারের প্রথম পক্ষ থাকেন। সে বাড়ীতে সুরেখার প্রবেশ নিষেধ। খুন করে ফেলবে প্রথম পক্ষের লোক, যদি দেখতে পায়। ওরা স্বীকারই করে না সুরেখার সঙ্গে বিবাহ।

২

সন্ধ্যাবেলা কানুর একটা এনগেজমেন্ট ছিল। বাইরে থেকে ঘুরে এসে দেখে সুরেখা দেবী তখনো যাননি। রমলা রান্নাঘরে।

"ব্যাপার কী! ওঁকে রাত্রে খেয়ে যেতে বলেছ বুঝি?"

"শুধু কি রাত্রে?" রমলা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "কাল সকালে, দুপুরে, রাত্রে। পরশু তরশু তার পরের দিন—"

"সে কী! আমাদের এখানে জায়গা কোথায়?"

"বলেছি ও কথা। শুনতে চান না। সঙ্গে কিছু নেই। একবস্ত্রে এসেছেন। কাল নাকি কোনখান থেকে আর একখানা শাড়ী নিয়ে আসবেন।"

"এ কী কাণ্ড! কলকাতা শহরে আর কি কেউ নেই তাঁর? আমরা তাঁর কে যে—"

"সাহস থাকে তো বলো না গিয়ে তাঁকে! আমার কাছেই যত সাহস!"

ভাবনায় পড়ল কানু। "ঘরণী, অকূল পাথারে তুমিই আমার তরণী। একটা বুদ্ধি দাও।"

"বুদ্ধি থাকলে তো বুদ্ধি দেব।" রমলা লুচি বেলতে বেলতে বলল,

"লুচি আমরাই কতকাল খাইনি। চোরাবাজারে কিছু কিনব না বলে ভাত পর্যন্ত একবেলা বন্ধ। কিন্তু কাকে এ সব বোঝাব, কে বুঝবে এ সব! ছেলেদের পড়ার ঘরে ক্যাম্প খাট পাততে হবে। বাথরুম খুলে রাখতে হবে বাইরের দিক থেকে। আবার ভিতরের দিক থেকে চাবী দেওয়া চাই।"

পরের স্ত্রীকে ঘরে স্থান দিয়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য ডেকে আনতে কে চায়? কানু ভেবে বলল, "মহালদার নিশ্চয় মোটা মাসোহারা দিয়ে থাকেন। হোটেলে গেলে পারতেন।"

"বলে দেখেছি ও কথা। হোটেলে দুর্নামের ভয়। মহালদার যদি রাগ করে মাসোহারা রহিত করেন।···ওয়াই. ডব্লিউ. সি. এ-তে ফোন করেছিলুম। ওরা রাজী, কিন্তু ইনি রাজী হলে তো! ওখানে নাকি স্বাধীনতা নেই। পদে পদে জবাবদিহি করতে হয়।"

কানু বিব্রত হয়ে বলল, "তা হলে তো এখানে থাকতে এসেছেন দেখছি।"

রমলা হেসে বলল, "দিনাজপুরেও থাকতে গেছলেন।"

হাসির কথা নয়। মহালদার মস্ত বড় লোক। তাঁর স্ত্রীকে তিনি জায়গা দিতে পারেন না, জায়গা দিতে হবে সম্পূর্ণ অনাত্মীয় এক অপরিচিত ভদ্রলোককে, যার অপরাধ সে সুপর্ণর বন্ধু, যে সুপর্ণ মহালদারের কেউ নয়, যে কবে সুরেখার মঙ্গল করতে চেয়েছিল। চমৎকার লজিক!

ওদিকে ভদ্রমহিলা একলাটি বসেছিলেন। রমলা বলল, "ভেবে কখনো কূলকিনারা পাবে না, যা হবার তা হবে। এখন গিয়ে ওঁর সঙ্গে একটু গল্প করো।"

কানুর হঠাৎ মনে পড়ল সুপর্ণদা এঁর এক আত্মীয়ের নাম করেছিলেন। সম্পর্কে ভাই। তার সঙ্গে কানুর কোথায় যেন আলাপ হয়েছিল। সরকারী কর্ম উপলক্ষে।

বসবার ঘরে গিয়ে কানু জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, গোকুল এখন কোথায় কাজ করে?"

ভদ্রমহিলা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "গোকুল? কোন গোকুল? গোকুলকে তো আমি চিনিনে।"

"বা! আপনার ভাইকে আপনি চেনেন না! গোকুল মজুমদার। পুলিশম্যান।"

"কে জানে! গোকুল বলে কারো সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। তবে শুনতে পাই সেই নামের একজন লোক কলকাতায় বদলি হয়েছে।"

কানু কী মনে করে টেলিফোনের কাছে গিয়ে ডাইরেক্টরিটা খুলে দেখল। ছিল তাতে গোকুলের নাম ধাম পদমর্যাদা ও ফোন নম্বর। কিন্তু সুরেখাদির সাক্ষাতে তাকে সব কথা বলা যায় না। আর ভদ্রমহিলা যেখানে বসেছেন সেখান থেকে গোকুলের উত্তরও তিনি স্পষ্ট শুনতে পাবেন। যাক, গোকুলকে যখন ডাইরেক্টরিতে পাওয়া গেছে তখন টেলিফোনেও যাবে। এই অকূল পাথারে গোকুলই একমাত্র ভেলা। কালকেই সে তার দিদিকে বাড়ি নিয়ে যাবে খবর পেয়ে। কোনো মতে একটা রাত কষ্ট করতে হবে কানুকে, রমলাকে।

তিন জন একসঙ্গে খেতে বসল। গোকুলের ভরসায় কানুর মন প্রসন্ন। রমলাও খুশি, অন্যত্র সুরেখাদির একটা আশ্রয় জুটবে। নিরাশ্রয়া নারীকে তো ঘর থেকে বার করে দেওয়া যায় না। গল্প করতে করতে আহার চলতে থাকল। ছেলেমেয়েরা খেয়ে দেয়ে শুতে

গেছে। বড়দের শোবার দেরি আছে। কথা বলতে বলতে কত কথা এসে পড়ল।

ছেলেবেলায় কনভেন্টে মানুষ। তারপর মেয়েদের কলেজে পড়েন এ-দেশে। বাপের ছিল প্রভূত সম্পত্তি ও প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষ। মেয়ের বিয়ে দেবেন না লেখাপড়া শেষ না হলে। লেখাপড়া শেষ হবে ও-দেশে। কলকাতার পর কেম্‌ব্রিজ। কেম্‌ব্রিজের ডিগ্রী নিয়ে কিছু কাল লণ্ডনে বাস করেন। তার পর দেশে ফিরে এসে দেখেন সংসারের অবস্থা ভালো নয়। দারুণ মন্দা। পারিবারিক ব্যবসা চলছে না। চাকরি করতে বাধ্য হন। কিন্তু চাকরিতে মন লাগে না। মা বাপ দু'জনেই মারা যান। তখন তিনি উদাসিনী হয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান।

সুবেখাদি বোধ হয় জানতেন না যে সুপর্ণর কাছে কানু আরো কিছু শুনেছিল, কানুর কাছে রমলা। কিন্তু সে সব যখন তিনি নিজের থেকে বললেন না তখন তাঁকে খুঁচিয়ে বলানো কি ঠিক হতো! রমলার দিকে চেয়ে কানু লক্ষ করল সেও সেই কথা ভাবছে। একটা কিছু ঘটেছিল লণ্ডনে। সেটা তিনি চেপে গেলেন। কানুর মন সতেরো আঠারো বছর আগে সুপর্ণর কাছে শোনা কথা বিস্মৃতির ভাঁড়ার ঘরে খুঁজতে লাগল।

একটু একটু করে মনে পড়তে লাগল কানুর। সাউথ কেনসিংটনে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ত দস্তিদার বলে এক ছোকরা। তার ছিল মুষ্টিযোদ্ধা বলে নাম ডাক। অমন দুঃসাহসী পুরুষ ইংলণ্ডেও বিরল। মোটর সাইকেল চড়ে সে ল্যাণ্ডস এণ্ড থেকে জন ও' গ্রোটস্ যায়। কত রকম কেরামতি দেখায়। পুলিশ থেকে তাকে শাসালে সে বলত, "He-bachelors don't care."

পড়াশুনায় সে তেমন ভালো ছিল না। কিন্তু পাঁচজনের উপকার করতে নিত্য তৎপর। মেয়েরা তাকে কী চোখে যে দেখত কোনো দিন তার বান্ধবীর অভাব হতো না। মোটর সাইকলটার পেছনে একজনকে না একজনকে বসে থাকতে দেখা যেত। আশ্চর্যের বিষয়, সুরেখার সাধ যেত তেমনি একজন হতে। একজন থেকে একমাত্র জন।

সুরেখা নিজে বিদুষী হলেও বিদ্বান যুবকদের উপর তাঁর তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। দস্তিদারকেই তিনি পূজা করতেন। পুরুষ বটে দস্তিদার। এ কালের বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ। বিয়ে যদি করতে হয় তবে আর কাউকে নয়। আর সকলে মেনিমুখো। কেম্‌ব্রিজের ডিগ্রী পাবার পর লণ্ডনে বসে থাকার উদ্দেশ্য দস্তিদারের বিবাহপ্রস্তাবের প্রতীক্ষা। এ সাধনা ব্যর্থ যাবার নয়। দস্তিদার তো স্বর্গ হাতে পেলো। এমন গুণবতী ভার্যা! ধনবতীও বটে। এঁর উপর ভর করে সারা জীবন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া যায়। তবে ব্যাচিলর থাকা চলবে না, এই যা দুঃখ!

সুরেখা দেবী কনভেন্টের সন্ন্যাসিনীদের হাতে গড়া। বিবাহের গোপনীয় দিকটার প্রতি তাঁর বিষম বিতৃষ্ণা। বিয়ের রাত্রে যা ঘটল তাতে তিনি দারুণ শক্ পেলেন। তাঁর ধারণা জন্মালো যে তাঁর স্বামী একটা পশু। অথচ সেই পশুর প্রতি তাঁর অপরিসীম আকর্ষণ। বিয়ের পর থেকে শুরু হলো এই আকর্ষণ বিকর্ষণের অধ্যায়। যাকে ভালোবাসেন তাকে ঘৃণা করেন। যাকে না দেখলে থাকতে পারেন না তার উপর রাগে জ্বলতে থাকেন।

স্বামী স্ত্রীর সহজ স্বাভাবিক সম্বন্ধ তাঁর কাছে অত্যন্ত অরুচিকর ও অশুচি একটা উৎপাত। নেহাৎ পশু না হলে এমন উৎপাত কেউ করে না। প্রত্যেকবারই তিনি কলঙ্কিত বোধ করতেন, যেন পাঁকের ভিতর

তাঁকে টেনে নামানো হচ্ছে। গ্লানিতে তাঁর মন ভরে যেত। লজ্জায় মাথা কাটা যেত। না স্বামীর সঙ্গে, না আর কারো সঙ্গে তিনি মুখ তুলে কথা বলতে পারতেন না। যেন পশুর সঙ্গে সহবাস করে তিনিও পশু হয়ে গেছেন। দেখতে মানুষের মতো, আসলে শুয়োর। বীভৎস! বীভৎস!

অথচ স্বামীটিকে তিনি চোখে চোখে রাখবেন। স্বামী যখন যেখানে যাবেন তিনিও যাবেন তাঁর সঙ্গে। মোটর সাইকেলের পিলিয়ন আর কোনো নারী অধিকার করবে না। এমনিতেই তিনি ভীতু বাঙালীর মেয়ে। কিন্তু এর বেলা তাঁর দুরন্ত সাহস। দস্তিদার বরাবরই বেপরোয়া ভাবে মোটর সাইকেল চালায়। এর জন্যে বহুবার তাকে পুলিশের হাতে পড়তে হয়েছে। বিয়ের পরে তার ব্যতিক্রম হলো না। তাকে জামিনে খালাস করানো, তার হয়ে জরিমানা জোগানো এসব লেগে থাকত বারো মাস। সুরেখার এতে অরুচি ছিল না। বরং তিনিই দস্তিদারকে উস্কানি দিতেন আরো জোরসে চালাতে। গাড়ী যত জোরসে চলত তিনি তত রোমাঞ্চ বোধ করতেন। থ্রিল পেতে পেতে তিনি থ্রিলের মাত্রা বাড়িয়ে দিতেন। হয় হবে য়্যাকসিডেণ্ট, যায় যাবে প্রাণ।

তার পর মুষ্টিযুদ্ধ তাঁর অসম্ভব ভালো লাগত। স্বামীর সঙ্গে রিং-এ যেতে স্বামীর চেয়েও তাঁর উৎসাহ বেশী। সে বেচারার নাকটা ইতিমধ্যেই থেঁতলানো হয়ে রয়েছিল। বিয়ের পরে কেই বা চায় মুখ-খানাকে চষা জমির মতো সমতল করতে! একটার পর একটা দাঁত যখন ঘুঁষির ঘায়ে মটকায় তখন দস্তিদারের অন্তরাত্মা বলে, আর না। এইবার বক্‌সিং ছেড়ে দেব। কিন্তু সুরেখা তাকে প্রতিশোধের প্রেরণা

জোগান। ও তোমার একটা দাঁত গুঁড়িয়েছে। তুমি ওর একাপাটি দাঁত উড়িয়ে দাও। পারবে তুমি। পারবে। তোমার মতো বীর ক'জন আছে! আমার চোখে তো তুমিই একমাত্র। ইচ্ছা করলে তুমি বুল ফাইটিং পারো। চলো না স্পেনে।

সুরেখার স্বভাবে প্রচুর পরিমাণে ভায়োলেন্স ছিল। তাইতেই তাঁকে দস্তিদারের দিকে টানে। অথচ তাঁর শিক্ষাদীক্ষা হয়েছিল সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে। এটা পাপ, ওটা পাক, সেটা পশুত্ব যত রকম অন্তর্নিষেধ (inhibition)। একটি বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষিতা না হয়ে থাকলে এ সব অন্তর্নিষেধ থাকত না। সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা শিক্ষিতা বলেই তিনি দস্তিদারের ব্যবহারে বিকার বোধ করতেন।

বছর দেড়েক পরে তাঁর একটি খোকা হয়। তখন তাঁর ভিতর মাতৃভাব জাগে। মা হবার জন্যে এত দিন যে উৎপাত সহ্য করেছেন এখন তো তা বরদাস্ত করার দরকার নেই। তাঁর বিকারবোধ দিন দিন তীব্র হলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হলো শুদ্ধিবোধ। মা হয়ে তিনি শুদ্ধ হয়েছেন। স্নান করে শুচিবাস পরে আবার কি কেউ পাঁকে নামে!

এর পরে খবর পাওয়া গেল দস্তিদার তার মোটর সাইকেলের পিঠে কাকে নিয়ে বেড়াতে গেছল, গতিবেগ বাড়াতে গিয়ে ধরা পড়েছে। করাও তাকে জামিনে খালাস, জোগাও তার জরিমানা। সুরেখা দেবীর কানে এলো, মেয়েটি আর কেউ নয়, তাঁরই গুণবতী মেড। তিনি মূর্ছা যেতে যেতে উঠে বসলেন। তিনি মূর্ছা গেলে তাঁর শিশুকে দেখবে কে!

যথারীতি বিবাহবিচ্ছেদের মামলা হলো। দস্তিদার প্রতিবাদ করল না। কিন্তু মামলার জন্যে হাঁটাহাঁটি করতে গিয়ে সুরেখা দেবী তাঁর

শিশুর যত্ন নিতে পারেন নি। ছেলেটি অসুখে ভুগে মারা যায়। এই ট্র্যাজেডীর পর তিনি উদাসিনীর মতো পথে পথে ঘুরে বেড়ান। সুপর্ণ তাঁর বাল্যবন্ধু সেই সময় বিলেত গেছলেন। তাঁকে ধরে নিয়ে এসে তাঁর মা-বাপের হাতে দেন। মেয়ের দশা দেখে তাঁদের রাগ পড়ে, তাঁরা ক্ষমা করেন। কিন্তু কী করে সেই উদাসিনীকে সংসারী করবেন এ কথা ভেবে ভেবে তাঁদের আয়ুক্ষয় হয়। সুপর্ণই পরামর্শ দেয় চাকরি নিতে। তাতেও যখন মতিগতির পরিবর্তন হলো না তখন সুপর্ণই প্ররোচনা দেয় সন্ন্যাস নিতে, প্রব্রজ্যা নিতে।

৩

পরের দিন গোকুল মজুমদারকে টেলিফোন করা গেল। গোকুল বাড়ী ছিলেন না, তাঁর স্ত্রী নাম ও নম্বর লিখে নিলেন কানুর। বললেন, "উনি আপনাকে আজকেই কোনো এক সময় রিং করবেন। ঠিক কোন সময় সেটা বলা শক্ত। জানেন তো, পুলিশের চাকরি।"

গোকুল যখন রিং করলেন তখন রাত দশটা। কানু তো হাল ছেড়ে দিয়ে শুতে যাচ্ছিল। বলল, "আপনার সঙ্গে আমার একটু জরুরি কাজ ছিল, মিস্টার মজুমদার। টেলিফোনে সেটা খুলে বলতে পারছিনে। আসুন না কাল আমাদের এখানে চা খেতে, মিসেসকেও নিমন্ত্রণ। পুরানো আলাপটা ঝালিয়ে নেওয়া যাক।"

গোকুল রাজী হলেন, কিন্তু পরের দিন নয়, আরো এক দিন পরে। তার মানে ভদ্রমহিলা আজকের দিনটা তো থাকলেনই, আরো দু'দিন থেকে যাবেন।

চায়ের দিন বিকেলে সব ঠিকঠাক, মিসেস মজুমদার রিং করে

জানালেন মিসেস বিশ্বাসকে, দুঃখিত। দিল্লী যেতে হচ্ছে মিস্টার মজুমদারকে। তিনি নিজেও এই সুযোগে এক বার ঘুরে আসতে চান দিল্লী। কাজেই চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব নয়। ক্ষমাপ্রার্থনা ও ধন্যবাদ।

রমলার কাছে কানু ওকথা শুনে বলল, "ভেলা ফস্‌কে গেল, ঘরণী। এখন তুমিই আমার তরণী। বুদ্ধি দাও।"

রমলা বলল, "ভেবে দেখি।"

কানু বলল, "আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। মহালদারকে ফোন করলে কেমন হয়?"

"ছি ছি! অমন কাজ কোরো না। মহালদার যদি জানতে পান যে তাঁর স্ত্রী আরেকজনের অন্দরে আছেন তা হলে তাঁর মতো মানী লোকের মানহানি হবে। সরাসরি বন্ধ করবেন সুরেখাদির মাসোহারা। মহালদার জানেন ইনি আনন্দময়ী মা'র আশ্রমে বাস করছেন। কথাটা ষোলো আনা অসত্য নয়। ইনি রোজ সকালবেলা ওখানে যান, গিয়ে খোঁজ নেন মাসোহারা এসেছে কি না।"

"তা যদি হয় তবে শুধু সকালবেলা কেন, সারা দিন সারা রাত ওইখানে থাকলে পারেন। এ বাড়ীতে এমন কী জাদু আছে! তাঁর কি অসুবিধা কিছু কম হচ্ছে!"

"জাদু না থাকলে কেউ দিনাজপুরে সাত দিন থাকতে চায়! কিংবা ঢাকায়! ওঁর বিশ্বাস মিস্টার বিশ্বাসের হাতে চাকরির কলকাটি। একবার ভালো করে ধরতে পারলে হয়।"

এই ক'দিনে রমলার মনোভাব অনেকটা নরম হয়েছিল। সুরেখাদি তার কাছে একটু একটু করে ভেঙে বলছিলেন গত কয়েক বছরের

কাহিনী। আরো বলবেন বলে সে আরো কিছুদিন তাঁকে জায়গা দিতে রাজী ছিল। আসলে কিন্তু এটা জায়গা দেবার সমস্যা নয়। সমস্যাটা সময় দেবার, মনোযোগ দেবার। বাড়ীতে একজন অতিথি থাকবেন, অথচ কেউ তাঁর কাছে গিয়ে বসবে না, তাঁকে সঙ্গ দেবে না, কেবল খাবার সময় দুটো কথা কইবে, এর নাম আতিথেয়তা নয়। সেইজন্যে রমলা যখনি অবসর পেতো তখনি স্বরেখাদির তত্ত্ব নিত, তত্ত্ব নেবার ছলে গল্প জমাতো।

সাত দিনের দিন কানু বলল, "আশা করি আজ তিনি চলে যাবেন।" রমলা বলল, "আজ যাবেন কি না জানিনে। তবে এই পর্যন্ত জানি যে কাল তাঁর মাসোহারা মনি অর্ডারে পেয়েছেন। ইতিমধ্যে একখানা ঘরের সন্ধান পেয়েছেন, তার জন্যে কিছু আগাম দিতে হবে।"

কিন্তু সেদিন বা তার পরের দিনও তিনি গেলেন না। ঘর তাঁর পছন্দ হয়নি। আরেকটা খুঁজছেন। একজন তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে যে এই সপ্তাহেই পাবেন।

সত্যি, স্বরেখাদিকে তাড়াবার জন্যে কেন যে কানুর এত ব্যস্ততা রমলাকে বুঝিয়ে বলা শক্ত। কানুর হাড়ে হাড়ে ভয় মহালদারকে। লোকটা যে-কোনো দিন এসে অপমান করতে পারে। ডাকসাইটে বড়লোক। কলকাতা শহরে কে না জানে তাঁর নাম! ওসব লোকের সঙ্গে শত্রুতা যেন জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ।

তা নইলে স্বরেখাদি আরো কিছু দিন থাকলে কার কী ক্ষতি! একটু পাগলাটে মানুষ, কখন কী বলেন তার ঠিক নেই, প্রায়ই স্বদেশের নিন্দা, বিদেশের প্রশংসা। আর স্বপর্ণকে হাতে পেলে ছাড়েন না। তাঁর বিশ্বাস স্বপর্ণই তাঁর সর্বনাশের গোড়া। স্বপর্ণ তাঁর নামে কানুর কাছে

কী লাগিয়েছেন জানতে তাঁর কৌতূহল। নিশ্চয়ই সমস্তটা ঝুটো। কানু কিন্তু পাশ কাটিয়ে যায়। জানতে দেয় না। রমলাকেও বলে এড়িয়ে যেতে।

এর পরে এক দিন রমলা বলল কানুকে, "সুপর্ণদা তোমাকে যা বলেছিলেন সব ভুল। দিদির বিয়েই হয়নি বিলেতে। তিনি কুমারী। এখনো তাই।"

"কী! কী!" কানু চমকে উঠল। "তার মানে!"

"তার মানে তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারিণী। অক্ষতযোনি। অপাপবিদ্ধা। মহালদারের সঙ্গে ওটা আধ্যাত্মিক পরিণয়। কামগন্ধ নাহি তায়।"

কানু হো হো করে হেসে উঠল। "মহালদারও তা হলে শুকদেব।"

এগারো দিনের দিন রমলার খেয়াল হলো যে তত দিনে মিসেস মজুমদার হয়তো দিল্লী থেকে ফিরেছেন। আবার চায়ের নিমন্ত্রণ করা উচিত। ফোন করতেই তিনি সাড়া দিলেন। কিন্তু চায়ের প্রস্তাব শুনে বললেন, "আগে কর্তার সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি।"

রমলার কী মনে হলো সে ফস করে বলে বসল, "আচ্ছা, তা হলে আমিই আসছি আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে। এখন সময় হবে কি?"

"আপনি আসবেন? সে তো আমার সৌভাগ্য! ওমা, এইজন্যে কেন এত দূর আসবেন?"

"কারণ আছে। নিমন্ত্রণও বটে, মন্ত্রণাও বটে।"

সত্যি সত্যি রমলা গিয়ে হাজির হলো বেলভিডিয়ার রোডে। মিসেস মজুমদার সব কথা শুনে বললেন, "আমরা যখন বরিশালে তখন আমাদের বাড়ীতেও দিদি আড়াই মাস ছিলেন। তা আপনার ওখানে তো এখনো একটা মাসও হয়নি। কলকাতায় এসে খবর পাচ্ছি কোথাও দু'মাস কোথাও তিন মাস এমনি করে দিদির বছর কেটে যায়।"

"তিনি যে বললেন তিনি বাড়ীর খোঁজে ঘুরছেন।"

"তার মানে কোনো একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ী, যেমন আমাদের কিংবা দূর সম্পর্কের বন্ধুর, যেমন আপনাদের। ভাড়া দিয়ে তিনি থাকবেন এ আমি বিশ্বাস করিনে।"

"কেন, তাঁর মাসোহারা তো মন্দ নয়। আমি দেখেছি মনি অর্ডার।"

"না, না। তা নয়। তাঁর নিজের ফ্ল্যাট আছে। সেখানে তাঁর খাট পালঙ্ক সোফা টেবিল বাক্স স্যুটকেশ এন্তার জিনিসপত্র। একজন মানুষের সেখানে পরম স্বচ্ছন্দে থাকা চলে, কিন্তু একা তিনি কিছুতেই থাকবেন না। তাঁর স্বামীকেও তাঁর সঙ্গে থাকতে হবে। কিন্তু স্বামী তো একা তাঁর স্বামী নন। সত্যি কথা বলতে গেলে স্বামীই নন।"

রমলা চমকে উঠল। "বলেন কী!"

মিসেস মজুমদার চোখ টিপে বললেন, "বুঝতে পারলেন না? আরো খোলসা করতে হবে? ওদের দু'জনের বিয়ে হয়েছে বটে, কণ্ঠীবদল না কী একটা পদ্ধতিতে। কিন্তু ইয়ে হয়নি।" খিল খিল করে হেসে উঠলেন মিসেস মজুমদার। এবং মিসেস বিশ্বাস।

এর পরে মিসেস মজুমদার যে বিবরণ দিলেন তার মর্ম এই :

রুদ্রপ্রয়াগ না জোশিমঠের আশ্রমে সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে মহালদারের প্রথম পরিচয়। মহালদার তখন মহাপ্রস্থানের পথে। মতলব একটা ফিল্ম তৈরি করে কয়েক লাখ কামানো। তাঁর সাজপোশাক কিন্তু মুমুক্ষুর। মুখে কেবল "শিব শম্ভু! শিব শম্ভু!"

সন্ন্যাসিনীকে ফিল্মে নামানো ও ফিল্ম তৈরি করে কয়েক লাখ কামানো—কেমন চমৎকার মিল! এমন চটকদার আইডিয়া আর কারো মাথায় গজায়নি। একাধারে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল।

কিন্তু সন্ন্যাসিনী যদি সম্মতি না দেন! কিসের আকর্ষণে দেবেন! ধনের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ নেই। অথচ ধন ছাড়া মহালদারের আর কী আছে!

আছে। আছে। অপ্রতিরোধ্য পৌরুষ। তাঁর জমিদারিতে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। সাহেব কালেকটার তাঁর গায়ে হাত দিতে সাহস পায় না, যদিও জানে যে তাঁর খাজনা আদায়ের রীতি ফৌজদারী আইনের আমলে আসে। খাজনা? খাজনার রসিদ দেন বটে, কিন্তু আদায় করেন একুশ রকমের আবওয়াব। তাঁর টাকা খাটছে কংগ্রেসে, মুসলীম লীগে, কমিউনিস্ট পার্টিতে, হিন্দু মহাসভায়। ইউরোপীয়ান ক্লাবেও তাঁর 'অবদান' আছে। থাকেন কলকাতায়, মাঝে মাঝে যখন মহালে আসেন টাকা ছড়িয়ে যান মক্তবে মাদ্রাসায় সংস্কৃত টোলে। সে টাকা সুদে আসলে উঠে আসে কিস্তিতে কিস্তিতে।

এই দুর্জয় পৌরুষের আকর্ষণ সন্ন্যাসিনীকে স্থির থাকতে দিল না। তিনি কলকাতা এলেন, সেখানে সুসজ্জিত ফ্ল্যাট পেলেন। পুরুষোত্তমের সঙ্গে কণ্ঠীবদল বা সেই জাতীয় কী একটা ঘটল গুরু মহারাজের নির্দেশে। গুরু তখন মহালদারের অতিথি। মহালদারও দীক্ষা নিয়ে গৃহীশিষ্য হলেন। আবশ্যকমতো গোপনীয়তা রক্ষা করা গেল। প্রথমপক্ষ ঘুণাক্ষরেও টের পেলেন না দ্বিতীয় পক্ষের অস্তিত্ব।

গুরুর আদেশ ছিল কেউ কারো অঙ্গ স্পর্শ করবেন না। কারণ এ তো লৌকিক বিবাহ নয়। অলৌকিক। সন্ন্যাসিনীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করা পাপ। গৃহীর পক্ষে সন্ন্যাসিনী হরণ করা পাপ। তাঁরা পরস্পরের মুক্তির সহায় হবেন। আধ্যাত্মিক জীবনের শরিক হবেন। নিবৃত্তিমার্গের

সহযাত্রী হবেন। সম্ভোগসুখ তাঁদের জন্যে নয়। তাঁরা হবেন গৃহস্থ সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসী গৃহস্থ।

গুরুর আদেশ সুরেখাদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। মহালদারও তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের অঙ্গ স্পর্শ করলেন না। কিন্তু না এলেন তিনি দ্বিতীয় পক্ষের সঙ্গে থাকতে, না ছাড়লেন প্রথম পক্ষের সঙ্গ। তিনি ওস্তাদ লোক। ভেবেছিলেন খাঁচায় একবার পুরতে পারলে পাখী আপনি পোষ বানবে। আস্তে আস্তে আসবে কাঞ্চনের মোহ। নাম যশের বাসনা। ফিল্মে অবতরণের কৌতূহল। আপাতত খাঁচাটাকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে হবে। তিনি নিত্য নতুন আসবাব পাঠাতে লাগলেন। নিত্য নতুন শাড়ী ব্লাউজ সালওয়ার পায়জামা স্ল্যাক্স।

দিদি আশা করেছিলেন তাঁর স্বামী তাঁর ফ্ল্যাটে বাস করবেন, তাঁর ধর্মজীবনের অংশীদার হবেন। দু'জনে মিলে জপতপ পূজো আর্চা করবেন। কিন্তু কে তাঁর স্বামী! যাকে তিনি তাঁর স্বামী বলছেন তিনি আরেকজনের স্বামী হয়ে আরেকজনের সঙ্গে ক্যামাক স্ট্রীটের ভবনে বিরাজ করছেন। সেখানে ধর্মজীবনের নয়, কামজীবনের ভাগী হচ্ছেন। পাপের ভাগী। পাকের দাগে দাগী।

নিরাশ হলে কী হবে! জোশিমঠে বা রুদ্রপ্রয়াগে ফিরে যাবার উপায় তো নেই। কলকাতার ফ্ল্যাটে থাকবেন অথচ সাধনসাথীকে কাছে পাবেন না, এ কি কখনো হয়! সংসারত্যাগী বৈষ্ণবরা যে কন্ঠীবদল করেন এ তো সকলের জানা। অনেকের কিন্তু জানা নেই যে হিমালয়ের কোনো কোনো মঠের মোহন্ত মহারাজরাও গৃহীদের মতো বিবাহ করেন। কোথাও কি শোনা গেছে যে স্বামী ও স্ত্রী এক সাধনায় দীক্ষিত হয়েও এক আবাসের আবাসিক হবেন না? অঙ্গ স্পর্শ

করবেন না বলে কি এক সঙ্গে ধ্যান করবেন না, এক কুটীরে বিশ্রাম করবেন না?

মহালদারকে ডেকে সুরেখা দেবী বললেন, স্ত্রী যেখানে স্বামী সেখানে। তা যদি না হয় তবে স্বামী যেখানে স্ত্রী সেখানে। হয় তুমি সাদার্ন য়্যাভিনিউতে এসে বাস করো, নয় আমাকে ক্যামাক স্ট্রীটে নিয়ে চলো। তোমার আমার স্থান এক নৌকায়। দুই নৌকায় নয়। নয়তো বিবাহের কোনো মানে হয় না। আর এসব আমাকে পাঠানো হচ্ছে কেন? আমি তোমাকেই চাই, তোমার ঐশ্বর্যকে নয়। আমার জীবনে রস ছিল না বলে আমি রস চেয়েছিলুম। অবশ্য আদি রস নয়। তা বলে রসের বদলে রসদ নিয়ে আমি কী করব?

মহালদার উত্তর দিতে পারলেন না। স্পষ্ট কিছু, নির্দিষ্ট কিছু করা তাঁর কোষ্ঠীতে লেখেনি। ধরাছোঁয়া দেওয়া তাঁর অভিধানে লেখে না। পাঁকাল মাছের মতো পিছলে যাওয়াই তাঁর স্বভাব। মাসোহারা যেমন আসছিল আসতে লাগল। শাড়ী জামা আসবাব যেমন আসছিল তেমনি। কিন্তু তিনি নিজে আর আসেন না। ডেকে পাঠালেও না। বলা বাহুল্য টেলিফোন তিনি ধরেন না। দিদি চিঠি লেখেন প্রায় প্রত্যহ। একখানারও যদি জবাব আসত!

আর সহ্য করতে না পেরে দিদি এক দিন ক্যামাক স্ট্রীটের প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হন। কাকে চান? তাঁর স্বামীকে। তা শুনে দাসী বাঁদীরাও তাঁকে দু'কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ল না। মহিলারা তো দেখাই করলেন না। বাইরে বসিয়ে রাখলেন। আর মহালদার সেই যে স্নানের ঘরে ঢুকলেন তারপর তাঁকে খবর দেয় কার সাধ্য! প্রথম পক্ষ ব্যাপারটা আঁচতে পেরেছিলেন। সকলের সামনে মাথা হেঁট হবে বলে না বোঝার

ভাণ করলেন। বলে পাঠালেন, "আজ হবে না, বাছা। আরেক দিন আসিস। তোর খাজনা মকুব করতে বলব।"

কেম্‌ব্রিজে পড়া সরকারী চাকরি করা সুরেখা সরকার। এই ছিল তোমার কপালে! শুনতে হলো অর্ধশিক্ষিত এক জমিদারবধূর কপট-সদয় তুই-তোকারি!

এর পরে সুরেখাদি সাদার্ন য়্যাভিনিউর ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে আনন্দময়ী মা'র আশ্রমে আশ্রয় নিলেন। সেখান থেকে গেলেন এক আত্মীয়ের বাড়ী। তার পরে বরিশালে গেলেন মজুমদারদের কাছে। এমনি করে অনেক ঘাট ঘুরে দিনাজপুরে যেতে চাইলেন কানুর ওখানে কিছু দিন থাকতে। তার পরে বাধল হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা। পরের ঘটনাকে তিনি আগের ঘটনা বলে কল্পনা করলেন। মনে হলো যেন দাঙ্গার ভয়েই তিনি কলকাতা ছাড়লেন। তালা ভেঙে কারা সব তাঁর ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল বটে। কিন্তু মহালদারের প্রভাবে পুলিশ সে ফ্ল্যাট খালি করে দেয়। তালা বন্ধ করেন মহালদার তাঁর সেরেস্তার লোক দিয়ে। এখনো সে ফ্ল্যাট খালি পড়ে আছে।

৪

রমলার মুখে এ বিবরণ শুনে কানু বলল, "সত্যি আমি খুব দুঃখিত। কিন্তু—"

জায়া বললেন, "থাক, আমার আজ মন খারাপ। তোমার 'কিন্তু' আরেক দিন শুনব।"

দিন তিনেক বাদে নৈশ ভোজনের পরে সুপর্ণর কথা উঠল। কথা-প্রসঙ্গে কানু বলল, "সুপর্ণদা আমাকে একখানা চিঠি দেখতে দিয়েছিলেন।

একটি লাইন এখনো আমার পরিষ্কার মনে আছে। ‘পুরুষেরা যত্রতত্র বিহার করে। তাদের রুচি যেমন কদর্য তাদের রীতি তেমনি কুৎসিত।’ কার হাতের লেখা তাও মনে আছে। বাচ্চু বলে কোনো মেয়ের।”

সুরেখাদির মুখে কালি দিলেও অত কালো দেখাত না। যেন তিনি ধরা পড়ে গেছেন। যেন কেউ জেনে ফেলেছে তাঁর গোপন কথাটি! উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা। তিনি হঠাৎ উঠে চলে গেলেন বসবার ঘর থেকে পড়ার ঘরে, যেখানে তাঁর জন্যে ক্যাম্প-খাট পাতা। ঘরে খিল দিয়ে ফ্যান খুলে দিলেন। সেই শীতের রাত্রে।

“সব মানুষকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াতে হয় না।” ক্ষুব্ধ স্বরে মন্তব্য করল রমলা। “ওঁর মতো মানুষের বেলা একটি বাক্যই যথেষ্ট।”

“তুমি কি মনে করেছ,” কানু বলল কৈফিয়তের চেষ্টায়, “আমি ওঁকে তাড়াবার জন্যে ও কথা তুলেছি? ওগো তা নয়। ভয়ে বলব কি নির্ভয়ে বলব?”

“নির্ভয়ে বলো।” রমলা অভয় দিল, কিন্তু ক্ষমা করল না।

তখন কানু ভেবে দেখল বলবে কি বলবে না। সেই সেদিনকার ‘কিন্তু’। সাতপাঁচ ভেবে বলেই ফেলল কথাটা। ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই রয়েছে।

বলল, “সুপর্ণদার ওই বদ্ অভ্যাস গেল না। একজনের চিঠি আরেক জনকে দেখানো। চিঠিখানার কিছু আধ্যাত্মিক মূল্য ছিল। কেননা তার অল্প দিন পরেই সুরেখাদি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে হিমালয়ে অদৃশ্য হন। অনেক সুন্দর সুন্দর কথা ছিল তাতে। কিন্তু আমার যেমন স্বভাব। আমি মণি মুক্তা ফেলে আরো গভীরে ডুব দিই। ওঠবার

সময় এমন কিছু তুলে আনি যা সমুদ্রের তলার মাটি বা কাদা। আমার মনে থাকে ওই রকম দু'টি একটি উক্তি।"

তার পরে আরো বিশদ করল। "সুরেখাদি তাঁর জীবনের আদি পর্ব একেবারে ভুলে যেতে চান। ভুলে যেতে চান যে তিনি বিয়ে করেছিলেন, মা হয়েছিলেন। ভুলে যেতে চান যে কেউ তাঁকে স্পর্শ করেছিল। সে এমন কেউ যার রুচি কদর্য, তার রীতি কুৎসিত। কিন্তু এসব অভিজ্ঞতা কি কেউ পারে ভুলতে! 'ভুলে থাকা, সে তো নয় ভোলা।' চাকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকলে ভুলে থাকা যায়। সন্ন্যাস নিয়ে চিত্তশুদ্ধি করলে আরো প্রশান্তভাবে ভুলে থাকা যায়। কিন্তু ভোলা যায় না। ভোলবার জন্যে তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করলেন। এবার তিনি এত শক্ত করে আটঘাট বাঁধলেন যে অসুন্দর অভিজ্ঞতা এড়াতে গিয়ে সুন্দর অভিজ্ঞতাও এড়ালেন। মধুর অভিজ্ঞতা না হলে তিক্ত অভিজ্ঞতাই একমাত্র অভিজ্ঞতা রয়ে যায়। এর থেকে উদ্ধারের একটিমাত্র পন্থা আছে, তার জন্যে দ্বার খুলে রেখেছেন তাঁর দ্বিতীয় স্বামী। তা বলে সে ভদ্রলোক তাঁর প্রথম পক্ষকে ছাড়তে পারেন না।"

জায়া তেতে উঠে ঝাঁজের সঙ্গে বললেন, "আমি জানি তোমাদের পুরুষ জাতের মনের কথা। দুয়ো সুয়ো দুটিকেই চাই। দ্বার খুলে রেখেছেন! কৃতার্থ করেছেন। কাপুরুষ! কী দরকার ছিল দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার! সন্ন্যাসিনীকে ভুলিয়ে অভিনেত্রী বানাবার! গুলী করা উচিত অমন লোককে।"

"কিন্তু দরকারটা দু'দিক থেকে।" কানু ভয়ে ভয়ে নিবেদন করল।

"আবার 'কিন্তু'!" জায়া শাসিয়ে উঠলেন।

দার্শনিকের মতো হাল ছেড়ে দিয়ে কানু বলল, "যাক, যা হয়েছে

ভালোই হয়েছে। মন্দ অভিজ্ঞতার উপর প্রলেপ বুলিয়ে ফল হতো হয়তো মন্দতর অভিজ্ঞতা।"

রমলা ফেটে পড়ল। " 'হয়তো' কেন? 'নিশ্চয়'। আমি তো ভেবে পাইনে কোনটা সেরা শয়তান। আগেরটা না পরেরটা? গুলী করতে হলে দোনলা বন্দুক চাই।"

"থ্যাঙ্ক গড!" কানু রঙ্গ করে বলল, "তে-নলা নয়!"

পরের দিন সকালে উঠে দেখা গেল দিদি চায়ের জন্যে অপেক্ষা করেননি। বেরিয়ে পড়েছেন। কী লজ্জার কথা! এ বাড়ীতে জলস্পর্শ করবেন না। কানু অনুতাপে অবনত হলো। রমলা মুখ ফুটে বলল না, চাউনি দিয়ে বলতে চাইল, কেমন? গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে তো? প্রহারেণ ধনঞ্জয়!

দিদি সারা দিন ফিরলেন না। রাত্রেও যে ফিরবেন সে ভরসা ছিল না। তবু রাত্রে খেতে বসার সময় কানু বলল, "আর একটু দেখি।"

"আর দেখবার আছে কী? কী দেখতে চাও তুমি?" গৃহিণী ঝঙ্কার দিলেন। "মানুষটা না হয় এক দিনের জায়গায় দু'দিন ছিল তোমার বাড়ীতে। কী এমন অসুবিধা হচ্ছিল তোমার! কেন তুমি অমন করে অভুক্ত অবস্থায় ঘাড় ধরে বার করে দিলে?"

সর্বনাশ! কানু মাথায় হাত দিয়ে বসল। তারপর ড্রাইভারকে ডাক দিয়ে বলল, "গাড়ি।"

"এত রাত্রে গাড়ি কেন? না খেয়েদেয়ে যাবে কোথায়!" জানতে চাইলেন সহধর্মিণী।

"যাব তাঁকে খুঁজে পেতে ফিরিয়ে আনতে। ঘাট মানতে।"

"থাক, আর পাগলামি করতে হবে না। ড্রাইভার, গাড়ি চাইনে।"

কানু বলল, "তা হলে আজ আমি খাব না।"

"খেতে হবে। না খেলে কাল কাজ করবে কী করে? না, ফাঁকি দিয়ে মাইনে পাবে?"

অগত্যা কানু আর রমলা খেতে বসল। সবে শুরু করেছে এমন সময় দিদি এসে হাজির। দিদি! ছুটে গেলেন গৃহিণী। কানু উঠতে যাচ্ছিল, তার উপর হুকুম হলো, "তুমি আস্তে আস্তে খাও।"

"একটা সুখবর দিতে এলুম, কানুদা।" দিদি বললেন আসন নিয়ে। "না, আমি শুধু এক গ্লাস দুধ খাব। চায়ের সময় গুরুভোজন হয়ে গেছে, খেয়াল করিনি।"

কানু বেশ অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ করল যে তাঁর মনে রাগ কিম্বা অভিমানের চিহ্ন নেই।

"বৌবাজার অঞ্চলে," দিদি বলতে লাগলেন, "একখানা ঘর পাওয়া গেছে। ভাড়া ত্রিশ টাকা। ভোরে উঠে প্রথম ট্রামে সেখানে গিয়ে পৌছই। এক সঙ্গে তিন মাসের ভাড়া হাতে গুঁজে দিই। ঘরখানা তেতালায়। ইকমিক কুকারে রান্না করতে দেবে। বাথরুম অবশ্য একলার নয়। ত্রিশ টাকার উপর আরো পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দিলে তাও এক দিন সম্ভব, কিন্তু তার আগে দেখতে হবে মাসে মাসে আর যে সব খরচ আছে তার থেকে কিছু বাঁচে কি না।"

এর পরে তিনি বলে চললেন বাড়ী সাজাবার জন্যে কী কী খরিদ করলেন, কী কী ভাড়া করলেন। সারা দিন কেটে গেল ঐ করে। বেলাশেষে তাঁর প্রতিবেশিনীরা তাঁকে ধরে খাইয়ে দিলেন। তখন পর্যন্ত তাঁর নির্জলা একাদশী চলছিল।

কানুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে রমলা বলল, "বাঁচলুম, দিদি। ভেবে-

ছিলুম আপনাকে কটু কথা বলেছি বলে আপনি ভোরে উঠে কিছু মুখে না দিয়ে চলে গেলেন। অমন করলে কি গৃহস্থের কল্যাণ হয়! উনি তো না খেয়ে না দেয়ে একটু আগে মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়ছিলেন আপনার খোঁজে কলকাতা শহরের সব দিকে।"

"কী জ্বালা!" তিনি খুশি হয়ে বললেন, "আমার জন্যে এত কাণ্ড কে কবে করেছে! কানুদা, আপনার কিন্তু ভাই বুদ্ধি বড় কম। যার জন্যে এত কাণ্ড করতে হয় সে বোন নয়, বৌ। মনের মতো বৌ পেয়েছেন। তা তো প্রত্যক্ষ করে গেলুম। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা।"

কানু বলতে যাচ্ছিল, সাক্ষাৎ দশপ্রহরণধারিণী। দোনলা কি তে-নলা বন্দুক যাঁর হাতে। কিন্তু আর ও প্রসঙ্গ নয়। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। ভালোর জন্যেই হয়েছে। এর পরে একটা চাকরি জোটাতে পারলে দিদির অতীত ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে।

পরের দিন যথাসময়ে ঘুম ভাঙলে দেখা গেল দিদি নেই। কখন উঠে চলে গেছেন, বিদায় নিয়ে যাননি। জলস্পর্শ করেননি। তা হলে কি তাঁর রাগ পড়েনি? ওটা কি তবে অভিনয়—ঐ প্রত্যাবর্তন ও প্রিয়ভাষণ?

ঠিকানা দিয়ে যাননি। বৃথা অন্বেষণ। রমলা আশা করেছিল একখানা চিঠি পাবে। ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি। বৃথা অপেক্ষা। ভদ্র-মহিলা নিরুদ্দেশ। ইচ্ছা করলে আনন্দময়ী মা'র আশ্রমে খোঁজ নিতে পারা যেত। কিন্তু কী দরকার!

(১৯৫৩)

রানীপসন্দ

লঞ্চ পাওয়া গেল অনেক দিনের অপেক্ষায়। কয়েকটি পরিদর্শনের কাজ বাকী ছিল। বছর শেষ হবার আগে ইনস্পেকশন শেষ হওয়া চাই। ছ'ধারে নদীতীরের দৃশ্য, সামনে রাঙামাটি অঞ্চলের পাহাড়ের সারি, কর্ণফুলীর বুকে লঞ্চ ভাসিয়ে দিতে না জানি কেমন রোমান্টিক লাগে। সঙ্গে কাগজ কলম নিয়েছিলুম। বহু কাল পরে কবিতা লিখব। সহযাত্রী বলতে সারেঙ, সুখানি ও তাদের দলবল আর আমার চাপরাশি খানসামা। তাদের উপর কড়া হুকুম ছিল কেউ যেন আমার কাছে না ঘেঁষে।

ডেক চেয়ারে বসে নোঙর তোলা দেখছি, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন দারোগা সাহেব। হাতে একখানা চিঠি। কী ব্যাপার! আবার কোথায় কী বাধল! আমাকে কি এরা স্টেশন ছাড়তে দেবে না! চিঠিখানা খুলে দেখা গেল, তা নয়। কলকাতা থেকে একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী এসেছেন। তাঁকেও যেতে হবে রাউজান। তিনি যদি আমার সঙ্গে যান, তা হলে কি আমার খুব বেশি অসুবিধা হবে? নয়তো তাঁকে একদিন চট্টগ্রামে বসে থাকতে হয়। পুলিশের লঞ্চ কাল ফেরবার কথা আছে।

অসুবিধা হবেই তো। কিন্তু সে কথা কি লেখনীর মুখে জানানো যায়! হয়ে গেল আমার কবিতা লেখা। মনে মনে বাপান্ত করলুম আর দেঁতো হাসি হেসে বললুম, "সে তো আমার পরম সৌভাগ্য।" দারোগা সাহেব গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি ঠুকে লম্বাচওড়া সেলাম করলেন। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, আপত্তি করলে এমন কী অভদ্রতা হতো! এমন কী জরুরি কাজ যে লঞ্চের জন্যে একদিন বসে থাকলে অপূরণীয় ক্ষতি হবে!

শিষ্টাচারে খান বাহাদুরের জুড়ি মেলে না। তিনি কী বলে যে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবেন বাংলাভাষায় শব্দ খুঁজে পেলেন না। ইংরেজী ও উর্দুর আশ্রয় নিলেন। পাঞ্জাবী মুসলমান। বয়সে অনেক বড়। গোঁফ দাড়ি রাখেন না বলে কতকটা কমবয়সীর মতো দেখায়। হাসিখুশি দিলদরিয়া মেজাজের লোক। ইতিমধ্যেই খবর নিয়ে জেনেছেন যে, আমি একজন সাহিত্যিক। বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আমার অনেক দিনের সাধ। সে আলাপ যে এই ভাবে হবে তা কে জানত! সত্যি, আমার একটুও ইচ্ছা ছিল না আপনার নির্জনতা ভঙ্গ করতে। আমি তো একদিন বসে থাকতেই চেয়েছিলুম, কিন্তু এস পি আমাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিল আপনার সঙ্গে লঞ্চে। শুনেছেন বোধ হয় খবরটা?"

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললুম, "কই, না! কোন খবর?"

"খুব খারাপ খবর।" ভদ্রলোক আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "তা নইলে, মশায়, ট্রাঙ্ক কল পেয়ে সোজা কলকাতা থেকে ছুটে আসি? আরে ছি ছি! শেমফুল! বেশরম!"

আমি রীতিমতো উৎসুক হয়ে উঠেছিলুম। কিন্তু জানতুম খান বাহাদুর আপনা থেকেই বলবেন, ভাণ করলুম যেন পরের কেচ্ছায় আমার কিছুমাত্র রুচি নাই।

"আপনারা সাহিত্যিক, আপনারা কথায় কথায় বলেন, সত্য শিব সুন্দর। কিন্তু আমার এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের অভিজ্ঞতা বলছে, যা সত্য তা সুন্দর নয়। যা সুন্দর তা শিব নয়। আমি যদি কোনো দিন কেতাব লিখি আমি কী লিখব, শুনবেন? লিখব, সুন্দর মেয়েরা প্রায়ই মন্দ হয়, মন্দ মেয়েরা প্রায়ই সুন্দর হয়।" এই বলে খান্‌বাহাদুর হো হো করে হেসে উঠলেন।

হাসলুম আমিও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বললুম, "আমাদের বাংলা দেশে নয় কিন্তু।"

ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করে বললেন, "না, বাংলা দেশে নয়! বাংলা দেশে কাজ করতে করতে চুল পেকে গেল, দাদা! আর এই যে রাইজান যাচ্ছি—"

"রাউজান।"

"রাউজান যাচ্ছি এটা কি বাংলা দেশের বাইরে!"

আলাপ দেখতে দেখতে জমে উঠল। আমি আমার খানসামাকে ডেকে পাঠাতেই তিনি বলে উঠলেন, "আরে না, না, দাদা। আপনি আমার মেহমান।"

কেমন করে আমি তাঁর মেহমান হলুম! লঞ্চ তো বলতে গেলে আমার। কিন্তু কে শোনে কার কথা! বিকেলের চা'র অর্ডার তিনিই দিলেন। লঞ্চ ততক্ষণে সদরঘাট ছেড়ে দিয়েছে।

পাশাপাশি দু'খানা ডেক চেয়ার পেতে পাহাড়ের দিকে মুখ করে আমরা জাঁকিয়ে বসলুম। খান্ বাহাদুর বলতে লাগলেন, "যে সে লোক নয়, দাদা। একটা সার্কলের ইন্স্পেক্টার। এক কালে আমি ওর এস পি ছিলুম। ওর কাজ দেখে তারিফ করেছি। প্রোমোশনের জন্যে সুপারিশ করেছি। মাথাপাগলা নয়, কবি নয়,—মাফ করবেন বেআদবি। সচ্চরিত্র বলে সুনামও ছিল ওর। এমন মানুষ কিনা চাকরির মায়া কাটিয়ে ছেলেমেয়ের দিকে না তাকিয়ে—বিবি নেই, নইলে আরো আফসোসের বাত হতো—এমন মানুষ কিনা হঠাৎ উধাও হলো।"

"উধাও হলো!" আমি চমকে উঠলুম।

"আর বলেন কেন লজ্জার কথা!" খান্ বাহাদুর রেশমী রুমাল দিয়ে

মুখ মুছলেন, চোখ মুছলেন। "গিয়েছিল খুনী মামলার তদন্ত করতে। বর্মী মেয়ে, মশায়। শয়তানকী লড়কী। তোরা বাঙালী মুসলমান, তোদের বরাতে সইবে কেন! বিয়ে করে এনেছিল রেঙ্গুন থেকে। যে লোকটা খুন হয়েছে তার কথা বলছি। অমন রূপসী নাকি বর্মাতেও নেই। সতীন আছে দেখে অমনি খসমের গলায় ছুরি দিয়েছে।"

আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলুম। কই, এ মামলার খবর তো আমার কাছে আসেনি!

"যা বলছিলুম। গিয়েছিল তদন্ত করতে। দারোগাই করছিল তদন্ত। তবে মেয়েটা বাংলা বোঝে না বলে ইন্‌স্পেক্টারকেও যেতে হয়েছিল। ওই তদন্তই ওর কাল হলো। এক দিন যায়, দু'দিন যায়, তদন্ত আর ফুরোয় না। শেষ কাণ্ডে দেখা গেল আসামীও নেই, অফিসারও নেই। হো হো! হা হা!"

হাসির কথা নয়। নারীহরণের মামলায় আমি কোনো দিন কাউকে ছাড়িনি। আমি বেশ একটু উষ্ণ হয়ে বললুম, "এত দিন আপনারা করছেন কী? কেন ওকে গ্রেপ্তার করা হয়নি? এ শুধু ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার নয়। কোর্টের ব্যাপারও বটে।"

খান্ বাহাদুর একটু কঠিন হয়ে বললেন, "কোর্টের ব্যাপার কি না সেইটেই তো প্রশ্ন। মেয়েটা বিধবা, সুতরাং ফুসলানির অভিযোগ টেকে না। মেয়েটার বয়স হয়েছে, সুতরাং হরণের অভিযোগ খাটে না। কোন ধারায় আপনি ওকে অপরাধী করবেন, শুনি?"

আমি নিরুত্তর। তিনি বাঁকা হাসি হেসে বললেন, "তার পর যদি ওরা বিয়ে করে থাকে? না, দাদা, অত সহজ নয়। চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে সকলে পারে, কলকাতার পুলিশ দপ্তর থেকে সে ব্যবস্থা

হবে। কিন্তু মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে আপনার হাত নিসপিস করলেও তার আগে আইনটা একটু মন দিয়ে পড়া লাগবে।”

সত্যি তাই। বড় মাছটা ছিপ থেকে ফস্কে গেলে যেমন কষ্ট হয়, তেমনি কষ্ট হলো আমার। খান্ বাহাদুর কিন্তু এর জন্যে দুঃখিত নন। বললেন, “শুনছি ওরা পার্বত্য চট্টগ্রামে গা ঢাকা দিয়েছে। সেখান থেকে বর্মা চলে যাবে হাঁটা পথে। তারপর ক’দিন রূপসীর অনুগ্রহ থাকবে কে জানে। লোকটাকে বাঁদর নাচিয়ে একদিন জবে করবে কি লাথি মারবে খোদা জানেন। সুন্দর মুখ দেখলে আমি দূর থেকে সেলাম করে সরে পড়ি।”

আইনের বই আমার সঙ্গে ছিল না। সেইজন্যে জোর করে বলতে পারছিলুম না যে আসামীকে যদি কেউ ফেরার হতে সাহায্য করে আইনে তার সাজা আছে। মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিলুম, তা লক্ষ করে ভদ্রলোক বললেন, “যে দিনকাল পড়েছে আপনি হয়তো ভাবছেন আমি পুলিশ বলে পুলিশের জন্যে আমার দরদ, আমি মুসলমান বলে মুসলমানের জন্যে আমার দরদ। সত্যি বলছি, তা নয়। আমি পুরুষ বলে আমার দরদ পুরুষের জন্যে। মেয়েটাই নরহরণ করেছে।”

এ কথা শুনে আমার ভিতরে যে ফেমিনিস্ট ছিল, সে প্রতিবাদ না করে পারল না। সে বলল, “যার মধ্যে বিন্দুমাত্র শিভ্যালরি আছে সে কখনো নারীকে দোষ দিতে পারে না। দোষ সব সময় পুরুষের। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারুর নয়। নিয়তির।”

“হাঁ, হাঁ। এ বাত ঠিক। নিয়তির।” খান্ বাহাদুর প্রীত হয়ে বললেন, “ঠিক এই রকম নিয়তির খেলা দেখেছি আমার প্রথম যৌবনে। আমার এক বন্ধুর জীবনে। বন্ধুটি হিন্দু। আপনি হয়তো মনে করবেন,

এ কী কথা! হিন্দু কবে থেকে মুসলমানের বন্ধু হলো? কিন্তু আজকের এই বিশ্রী আবহাওয়া বিশ বছর আগে ছিল না। মহাযুদ্ধের শেষে আমরা দু'জনে যখন মিলিটারি থেকে বেরিয়ে পুলিশের চাকরি পাই, তখন কে হিন্দু কে মুসলমান! আহা, সে সব দিন কি আর ফিরবে না!"

তাঁর কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর। স্মৃতির সরণি বেয়ে তিনি বিশ বছর নিচে নেমে গেলেন, যেখানে সঞ্চিত ছিল পুরাতন মদিরা। অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, "ঘটনাটা কতকালের পুরোনো। আমারই মনে ছিল না। হঠাৎ কেমন করে মনে পড়ে গেল। এই যে, বেশ স্পষ্ট মনে পড়েছে। দেখতে দেখতে সব উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।"

তাঁর দিকে চোখ ফেরালুম। তিনি কি সেই মানুষ না আর কেউ! একজন নওজোয়ান অর্ধশয়ান হয়ে স্বপ্ন দেখছে। হু হু করে ছুটে আসছে বাতাস! বাতাসকে ঠেলা দিয়ে ছুটে চলেছে লঞ্চ। জল দু'ভাগ হয়ে চিরে-চিরে যাচ্ছে কাটা কাপড়ের মতো। ঢেউ পড়ে থাকছে পিছনে। ঢেউয়ের দোলা লেগে উঠছে ও নামছে পেছিয়ে যাওয়া সাম্পান।

খান্ বাহাদুর বলতে লাগলেন।

২

মেহেরবান সিং রাজপুত ঘরানা। আমার পূর্বপুরুষরাও রাজপুত ছিলেন। যে যাই বলুক, রক্তের টান বলে একটা কিছু আছে। রাজপুতের সঙ্গে আমি যতটা আত্মীয়তা বোধ করি এ দেশের মুসলমানদের সঙ্গেও ততটা নয়। তা বলে হিন্দু ধর্মে আমার বিশ্বাস নেই। ধর্মের বেলা আমি গোঁড়া মুসলমান। তখন এই সারেং সুখানি চাপরাশি খানসামা আমার আপনার লোক। আর মেহেরবান সিং আমার এমনি একজন দোস্ত।

কিন্তু ওর মতো দোস্ত তখনকার দিনে কেউ আমার ছিল না। রোজ আমাদের দেখা হতো। আর দেখা হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত খোশ গল্পে আর দিবাস্বপ্নে। খেলার শখ ছিল দু'জনেরই। শিকারের বাতিকও দু-জনেরই। তখনকার দিনে সিনেমা ছিল না এখনকার মতো। আমাদের যেখানে চাকরি সেখানে মাঝে মাঝে সিনেমা আসত কিছু দিনের জন্যে। সে ক'টা দিন আমরা দু'জনে একসঙ্গে সিনেমায় যেতুম। তামাশা দেখতুম। অন্যান্য অফিসারদের মতো আমরা গান শুনতে বাঈজীর বাড়ি যেতুম না। দু'জনেই ছিলুম পিউরিটান কিসমের লোক। ওর বিয়ের কথাবার্তা চলছিল, আমার বিবি তখন বাপের বাড়ীতে। ও চায় শিক্ষিতা মেয়ে। তখনকার দিনে মেয়েদের লেখাপড়ার রেওয়াজ ছিল না।

এখন হয়েছে কি, পাঞ্জাবের ঐ ক্যাণ্টনমেণ্ট শহরটিতে এক মিলিটারি কণ্ট্রাক্টর ছিল, তার অনেক লাখ টাকা। আমরা যখন সেখানে যাই, তখন সে মারা গেছে। তার সম্পত্তির অর্ধেক পড়েছে তার বড় বৌয়ের হিস্‌সায়, অর্ধেক তার ছোট বৌয়ের হিস্‌সায়। বড় বৌ থাকে ঠাকুর দেবতা নিয়ে। আর ছোট বৌ থাকে আমোদ প্রমোদ নিয়ে। দু'জনের একজনেরও বালবাচ্চা হয়নি। যে যার নিজের মহলে থাকে। নিজের দাসদাসী, নিজের গাড়ীজুড়ি। বিলকুল আলাদা বন্দোবস্ত। লোকে বলত বড় রানী ছোট রানী, কারণ স্বামীর রাজা খেতাব ছিল।

আমরা যখন সেখানে যাই তখন সকলের মুখে শুনি সুরযভান যেমন সুন্দরী তেমন সুন্দরী কেউ কোথাও দেখেনি। কিন্তু সুন্দরী হলে হবে কী, তার চালচলন তেমন ভালো নয়। সে পর্দা মানবে না। ক্লাবে যাবে। সাহেবদের সাথে নাচবে। স্টেশনের যত অফিসার সবাইকে

ডেকে পার্টি দেবে। কেউ তাকে দু'বার একই শাড়ী পরতে দেখেছে বলে শোনা যায় না। তার জুতো কমসে কম দু' পাঁচশো জোড়া হবে। সে নাকি দুধের সর মাখে আর দুধের হাউজে গোসল করে। আর সেই দুধ নাকি পরে বাজারে বিক্রী হয়।

জোর গুজব সে যাকে একবার নেক্ নজরে দেখবে তার কোনো কামনা অতৃপ্ত রাখবে না। সে যেই হোক্ না কেন। তার কাছে জাতের বিচার নেই, সে ধন চায় না, উপহার চায় না। কেবল তার পছন্দ হলে হলো। পছন্দ কিন্তু সহজে হয় না।

জয়েন করার দু'তিন সপ্তাহ্ পরে আমার নামেও সুরযভানের নিমন্ত্রণপত্র এলো। গার্ডেন পার্টির নিমন্ত্রণ। মেহেরবানকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেলুম তার নামেও এসেছে। কিন্তু সে যাবে না। কেন যাবে না? কারণ, সে অমন স্ত্রীলোকের সংস্রব রাখতে চায় না।

আমি রসিকতা করে বললুম, "এক জাতের আম আছে, তার নাম রানীপসন্দ্। তোমার ইচ্ছা করে না রানীপসন্দ্ হতে?"

"আমি তো আম নই। আমার আত্মসম্মান আছে। চিরকাল পছন্দ করে এসেছে পুরুষ। পছন্দের অধিকার পুরুষের। এ ক্ষেত্রে তা নয়। সুরযভান আমাকে চোখ দিয়ে যাচাই করবে! আর চাই কি আমাকে নাপছন্দ করবে!" বলতে বলতে তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

"কেন? স্বয়ংবর তো রাজপুতদেরই প্রথা।"

"হাঁ, কিন্তু স্বয়ংবরে যারা নাপছন্দ হতো তারা লড়াই করে কেড়ে নিত। তা ছাড়া কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! কোথায় কুমারীর স্বয়ংবর আর কোথায় বিলাসিনীর লীলামৃগয়া!"

মেহেরবানকে আর এ নিয়ে উত্ত্যক্ত করলুম না। আমি একাই

গেলুম। সুন্দরী বটে সূরযভান। কী করে তার বর্ণনা দেব! আমি তো আপনার মতো কবি নই। অন্ধকার রাত্রে আতসবাজি ছাড়লে যেমন আসমান উজালা হয়, নানা রঙের তারা ফুটে ওঠে, ক্ষণকালের জন্যে ভুলে যাই যে যা দেখছি তা বারুদ গন্ধক সোরা ইত্যাদির খেল, তেমনি বহুজনের মেলায় সূরযভানের উদয়। প্রত্যেকেই বেশ কিছুটা আত্মসচেতন হতো। আয়না থাকলে আয়নায় মুখ দেখে নিত। কে জানে মুখখানা রানীপসন্দ্ কি না!

তারপর যতবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি ততবার গেছি। রানীপসন্দ্ হতে নয়। এমনি আতশবাজি দেখতে। কিন্তু মুশকিল হলো মেহেরবানকে নিয়ে। সে না পারে যেতে, না পারে থাকতে, না পারে বদলি হয়ে পালাতে। তার গর্ব তাকে যেতে দেয় না। তার কৌতূহল তাকে থাকতে দেয় না। তার কর্তব্যবোধ তাকে পালাতে দেয় না। আমি বুঝতে পারি সে ছটফট করছে। তাকে বলি, "তুমি ছুটি নিয়ে বাড়ী যাও। সাদী করো।" সে চুপ করে শোনে। উত্তর দেয় না।

একদিন সূরযভান আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, মেহেরবান সিং আপনার বন্ধু না? তিনি কেন আসেন না? আপনি তাঁকে নিয়ে আসতে পারেন না?"

আমি কোনো মতে পাশ কাটিয়ে যাই। সত্যি কথা বলি কী করে? সদা সত্য কথা বলিও, পাঠ্যপুস্তকেই শোভা পায়। কিন্তু ফিরে গিয়ে মেহেরবানকে খুলে বললুম। সে ও কথা শুনে কেমন যেন দিশাহারা বোধ করল! খুশি হবে, না রাগ করবে, না কী করবে বুঝতে পারল না। আমাকে ফেলে বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

পরের বার সূরযভানের পার্টিতে দেখি মেহেরবান হাজির। আমিই

পরিচয় করিয়ে দিলুম। আয়না কোথায় পাব? থাকলে একখানা এনে দিতুম। তবে তার দরকার হলো না। সুরযভানের চোখই তো আয়না। সেই সুন্দর কালো চোখে মেহেরবান দেখতে পেলো তার নিজের আরক্ত মুখ। লজ্জায় আরক্ত। এক দু' সেকেণ্ডের মধ্যে কত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল। কেউ টের পেলো না। আমি ছাড়া।

মেহেরবানকে আমি ক্ষ্যাপাতে চেয়েছিলুম, কিন্তু সাহস হয়নি। তার চেহারা দেখে পেছপাও হয়েছি। সে কলের মতো কাজ করে যায়। ডিউটি বাজিয়ে যায় সমানে। আমাব সঙ্গে মেলামেশারও বিরাম নেই, তবু ভিতরে ভিতরে বদলে যেতে থাকে। আপনা থেকে আমাকে যদি কিছু বলে তো শুনি। গায়ে পড়ে আমি কিছু বলিনে।

তার সর্বশরীর উন্মুখ হয়ে রয়েছে একজনের জন্যে। সমস্ত মন পড়ে আছে ওর কাছে। অথচ স্বীকার করবে না। মুখে বলবে অন্য কথা। বলবে, "আমি ওকে ঘৃণা করি। ওর অঙ্গ দূষিত। ওর সঙ্গ দূষিত। ওটা একটা গণিকা ভিন্ন আর কী! টাকা নেয় না, এই যা তফাৎ। আমার যদি খেয়াল হয় আমি সরাসরি কোনো এক গণিকার কাছে যাব। সেখানে আমার পছন্দ খাটবে। আমি দাম দিয়ে ভোগ করব। কিসের দুঃখে সুরযভানের দ্বারস্থ হব! হলে যে সে-ই আমাকে পছন্দ করবে, সে-ই দাম দিয়ে ভোগ করবে। আমি কি রানীপসন্দ্?"

এমনি কত লেকচারই না শুনতে হতো আমাকে দিনের পর দিন। তার ভিতরে একটা দ্বন্দ্ব চলছে। সে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। আমার কাছে কবুল করবে না যে সে আকৃষ্ট হয়েছে। আমি বুঝি সবই, কিন্তু জানতে দিই না যে আমি বুঝি। আমি বলি, "কেউ তোমাকে যেতে সাধছে না। তুমি না গেলে যে কেউ কিছু মনে করবে তাও নয়।

সুরযভান যেমন সবাইকে নিমন্ত্রণ করে তেমনি তোমাকেও করে। কাকে ওর পছন্দ কাকে নয় তা কি ও প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দেয়? ওসব ইশারায় ঠিক হয়ে যায়। অনেক রাত্রে কোনো এক সঙ্কেতস্থলে ওর গাড়ি এসে দাঁড়ায়। কোনো একজনকে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়। কেউ লক্ষ্য করে কি না সন্দেহ। তার পর ফিরিয়ে দিয়ে যায় আরেক জায়গায়।"

"পাজি মেয়েমানুষ! বদমায়েস মেয়েমানুষ!" মেহেরবান তেতে উঠে গালাগাল দেয়। "ডাকু মেয়েমানুষ! শয়তান মেয়েমানুষ!" আর যা যা বলে তা অশ্রাব্য অশ্লীল।

আমি প্রতিবাদ করি, "তোমার তো কোনো লোকসান করেনি। তুমি কেন ইতর ভাষায় আক্রমণ করছ? এটা কেমন ধারা সভ্যতা?"

কয়েকদিন পরে মেহেরবান বলে, "সেদিন যে বলছিলে সব ঠারে ঠোরে ঠিক হয়ে যায়, কী ঠার? বাজারে একখানা চটি বই পাওয়া যায়। তাতে একরকম ঠার আছে।"

আমি বলি, "তোমার তাতে কাজ কী? তুমি তো যাচ্ছ না। না যাচ্ছ?"

"আমি যাব ঐ খান্‌কিটার বাড়ী! অসম্ভব। আমার নাম মেহেরবান সিং। আমরা হলুম চৌহান রাজপুত। অবস্থার ফেরে পুলিশের চাকরি করতে হচ্ছে। তা বলে কি আমাকে অধঃপাতে যেতে হবে! শেষকালে তুমিও আমাকে ভুল বুঝলে! তুমি রাঠোর বংশধর!"

কী আর করি! চুপ করে শুনে যাই। লোকটা দিন দিন বাউরা হয়ে উঠছে। যা করতে তার প্রাণ চায় তা করলে তার মান যায়। আর কী দুর্বার আকর্ষণ ওই সুন্দরী নারীর! ঐ মন্দ নারীর! ও যাকে কামনা করবে তাকে পাবেই। চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যাবে লোহাকে।

আমার বরাত ভালো আমাকে চায়নি। কিন্তু মেহেরবানকে যেন টোনা করেছে। বশীকরণ বলে একটা বিদ্যা আছে, তা আগে বিশ্বাস করতুম না। ক্রমে প্রত্যয় হলো। মেহেরবান আমার পাশের বাসায় থাকত। তার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখলুম। রাত দশটায় বেরিয়ে যায়। শেষ রাত্রে ফেরে। উস্কোখুস্কো চেহারা। পাগলের মতো চাউনি। কথাবার্তার বাঁধুনি নেই। কী যে বলে যায় আবোল তাবোল! বুঝতে পারি কেবল অশ্লীল শব্দগুলো। ঝুড়ি-ঝুড়ি অশ্লীল কথা। হিসাব করে দেখি দিন দিন বাড়ছে তাদেব সংখ্যা।

ইচ্ছা করে ওর বাড়ীতে খবর দিয়ে গুরুজনকে আনাতে। এখনো বেশীদূর গড়ায়নি। যা ঘটবার তা ঘটেনি। এই বদ্ খেয়াল এক দিনে মিটে যায় সুন্দর মেয়ে দেখে বিয়ে দিলে। তারপর শিয়ালকোট থেকে বদলি হয়ে লাহোর বা অমৃতসর গেলেই সূরযভান ঠিক আতশবাজির মতো নিবে যাবে। কিন্তু মেহেরবানের গুরুজনকে খবর দিতে আমার সাহসে কুলোয় না। ও যদি রাগ করে। মানুষটা এমনিতে বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের। কিন্তু রাগলে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়।

এর পরে যেদিন সূরযভানের পার্টিতে যাই সেদিন মেহেরবানও যায়। সেদিন ঠারেঠোরে সব ঠিক হয়ে যায়।

৩

দিন কয়েক পরে আমি পরেডের জন্যে পোশাক পরছি মেহেরবান সিং এসে বাগড়া দিল। তার চোখে মুখে প্রতি অঙ্গে জয়ের উল্লাস। তবু বিষাদের ভঙ্গী করে বলল, "আমি মরে গেছি।"

আমি অনুমান করলুম এর অর্থ কী। তা হলেও ভড়কে গিয়ে বললুম, "কেন! কী হয়েছে!"

"আমি রানীপসন্দ্ বনে গেছি!" সে করুণ স্বরে বলল।

"হুঁ!" আমি গম্ভীরভাবে বললুম, "কাজটা ভালো হয়নি। তার প্রমাণ তুমি পরেডে ফাঁকি দিচ্ছ। অমন করলে চাকরি রাখতে পারবে না।"

সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। "আমি অসহায়। আমার নিয়তি আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে! তুমি তো আমার বন্ধু, তুমি আমাকে একটা পরামর্শ দিতে পারো?"

"কী পরামর্শ?" তার জন্যে সমবেদনায় আমার দিল দরদ হয়েছিল।

"আমি দাম দিতে চাই।" সে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "না দিলে আমি বান্দা বনে যাব। আমার ইজ্জত থাকবে না।"

আমি ভেবে বললুম, "ওর কিসের অভাব যে ও তোমার কাছ থেকে টাকা নেবে? আর উপহার তুমি পঞ্চাশ টাকার দিলে ও পাঁচ হাজার টাকার দেবে।"

"আমি লাখ টাকার দেব।" সে তেজের সঙ্গে বলল। "কিন্তু কোথায় পাব লাখ টাকা? কার তোশাখানায় হানা দেব? ট্রেজরি লুট করলে কেমন হয়?"

আমি তার কথাবার্তা শুনে আঁতকে উঠলুম। সেইদিনই তার বাড়ীতে চিঠি লিখে দিলুম। অবশ্য রেখে ঢেকে। তার উপর কড়া নজর রাখতে হলো। পাছে বাটপাড়ি রাহাজানি করে। পরেড ফাঁকি দেবার জন্যে সে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। ডাক্তারকে আমি বলে এলুম হাসপাতালে ভর্তি করতে। অবশ্য ওসব কথা ভেঙে বলিনি।

তার বড় ভাই ছুটে এলেন তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে। ছুটি না পেলে সে যায় কী করে? ছুটির জন্যে দরখাস্ত করতে হলো। যতদিন মঞ্জুরী না আসে, ততদিন সবুর করতে হবে। ইতিমধ্যে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল। একদিন সকালবেলা উঠে শুনলুম মেহেরবান সিং নিরুদ্দেশ। খোঁজ নিয়ে জানতে পেলুম সূরযভানও নিরুদ্দেশ।

ঢি ঢি পড়ে গেল শহরময়। সূরযভানের যারা ভক্ত তারা বলাবলি করল, হায়! হায়! সামান্য একটা পুলিশওয়ালার জন্যে কুলে কালি দিল! আর মেহেরবানের যারা বেরাদার তারা বলাবলি করল, হায়! হায়! সাময়িক একটা মোহের জন্যে সারা জীবনের কেরিয়ার মাটি করল।

কেবল দু' পাঁচজন লোক রসিয়ে রসিয়ে বলল, রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব পেলে আমরাও নিরুদ্দেশ হতুম, হে। আর সূরযভানও কম বুদ্ধিমতী নয়। ছোকরা যেমন খানদানী তেমনি সুপুরুষ।

আমার মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেল। বড় ভাই যখন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন তখন আমিও তাঁর সঙ্গে কিছু দূর গেলুম। তিনি বললেন, "অদৃষ্ট!" আমি বললুম, "কিসমৎ।" আমরা হিন্দু মুসলমান একমত। যার নসীবে যা আছে তা তো ঘটবেই।

মাসের পর মাস যায়। মেহেরবানের খবর পাইনে। ওদিকে সূরযভানের বাড়ী অন্ধকার। তার কর্মচারীরা বলতে পারে না সে কোথায়। আমি আমার ডিউটিতে মন দিই।

এক বছর বাদে মেহেরবানের পাত্তা মিলল। সে তখন আজমীর শরিফে। আমাকে লিখেছে আজমীর গিয়ে তীর্থ করতে। বুঝতে পারলুম আমার পরামর্শ চায়। ছুটি নিয়ে আজমীর গেলুম জেয়ারত

করতে। মেহেরবান আমাকে ধরে নিয়ে গেল তার কোয়ার্টার্সে। দেখলুম বেশ আছে ওরা তুটিতে। বৌ সেজে স্বরযভান খুব লাজুক হয়েছে। আমার সামনেও আধা পর্দা।

মেহেরবানের কাছে যা শুনলুম তা বলছি।

শিয়ালকোট থেকে পালিয়ে ওরা নানা জায়গায় যায়। যেখানেই যায় সেখানেই কথা ওঠে, তোমাদের পরিচয় কী? স্বামী-স্ত্রী? এর উত্তরে স্বরযভান বলে, হাঁ। কিন্তু মেহেরবান মুখ বুজে থাকে। কিছুতেই তার মুখ দিয়ে বার হয় না যে, তারা স্বামী-স্ত্রী। শুধু অসত্য নয়, অপ্রিয়ও বটে। অথচ ও রকম একটা পরিচয় না দিলে ঘর পাওয়া যায় না, চাকর পাওয়া যায় না, সাহায্য পাওয়া যায় না, সমাজ পাওয়া যায় না। তা হলে থাকতে হয় গিয়ে বাজারে। তেমন প্রস্তাবে স্বরযভান জ্বলে উঠবে। সেও কম গর্বিতা নয়। সে কি বাজারের বেশ্যা!

তারপর যেখানেই যায় সেখানেই অবশেষে জানাজানি হয়ে যায় যে ওরা বিবাহিতা নয়। একদল যুবক জোটে ভাগ দাবী করতে। সৌন্দর্য এমন সামগ্রী যে, ভাগ না দিয়ে ভোগ করতে গেলে কেউ সহ্য করবে না। ঢিল মেরে তাড়াবে। পুলিশের কাছে নালিশ করতে যাও, পুলিশ চাইবে বিবাহের প্রমাণ। নয়তো মোটা ঘুষ। মেহেরবান হৃদয়ঙ্গম করল যে একা ভোগ করতে হলে শুধু দখল নয়, স্বত্ব থাকা চাই। স্বরযভান যে তার বিবাহিতা পত্নী এর দলিল দাখিল করতে হবে।

রাজপুতের ছেলে। বিয়ে করবে কিনা বেনের বিধবাকে! তাও যদি সে সতী নারী হয়ে থাকত। বুক ফেটে কান্না আসে। এমনিতেই তার মাথা হেঁট। এর পরে কি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাবে! মেহেরবান ভেবে দেখলে পালাবার পথ নেই। চাকরি তো জুটবেই না, গ্রামে ফিরে

গিয়ে চাষ করতে গেলেও গুরুজনের তিরস্কার দুবেলা শুনতে হবে। কেই বা তাকে বিয়ে করবে তখন! বিয়ে না করলে স্ত্রীসহবাসের কী উপায়! তবে কি সে এই বয়সে সন্ন্যাসী হবে।

যদি না পালায় তা হলে দুটি মাত্র পন্থা। হয় বিয়ে, নয় ভাগ। দুটোতেই মেহেরবানের সমান বিতৃষ্ণা। আর সুরযভানের? মেহের-বানের বিশ্বাস দুটোতেই সুরযভানের সমান তৃষ্ণা।

ভাগ সে প্রাণে ধরে করবে না। তার চেয়ে মরণ ভালো। তা হলে বাকী থাকে—বিয়ে। বিয়ের নাম করলে তার চোখে জোয়ার আসে, তার হৃদয় হা হা করে। তার জাতকুলের গর্ব, তার পৌরুষের দর্প, তার নীতিবোধ বিষম ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়।

বাধ্য না হলে সে কিছুতেই ও কাজ করত না। বিয়ে! রাঁড়কে বিয়ে! বেনেনীকে বিয়ে! অসতীকে বিয়ে! বাধ্য হলো ভাগীদারদের দাবীদাওয়া এড়াতে। ভাগ না করে নির্বিঘ্নে ভোগ করতে। অবিভক্ত স্বত্বে স্বত্ববান হতে।

বিয়ের পরেই ফতোয়া দিল, পর্দানশীন হতে হবে।

সুরযভান এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু বিয়ের জন্যে সে মনে মনে কৃতার্থ বোধ করছিল। রাজপুত্র তাকে বিয়ে করবে এ যে তার শৈশবের স্বপ্ন। এমন অলৌকিক ঘটনা যদি বা ঘটল তবে তার জন্যে কিছু কষ্ট সইতে হবে বৈকি।

স্ত্রীকে পর্দায় পুরে মেহেরবান এবার নিশ্চিন্ত হলো। এর পরে তাকে জীবিকার চেষ্টা করতে হবে। এর জন্যে পাঞ্জাবের বাইরে যাওয়া স্থির করল। যেখানে গা ঢাকা দেওয়ার দরকার নেই। সোজা নিজের পরিচয় দেওয়া চলে। ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলো আজমীরে। তার

জঙ্গী রেকর্ড দেখিয়ে রেলওয়েতে কাজ পেলো। মাইনে বেশী নয়। কিন্তু নিজের অন্ন।

এখানে দেখা দিল নতুন এক সমস্যা। রেলওয়ের কাজে মাসে বিশ দিন সফর করতে হবে। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া শক্ত। একা রেখে গেলেও ভাবনা। অমন একখানি সাত রাজার ধন মাণিক যার ঘরে সে যদি বাইরে বাইরে রাত কাটায় তা হলে কেউ হয়তো মওকা পেয়ে সিঁদ কাটবে। আর থানার খাতায় লেখা হবে গয়না কাপড় তৈজসপত্র চুরি গেছে। আসলে কী চুরি গেল তা তো লেখবার মতো কথা নয়। যার চুরি গেল সে তখন সফরে।

মেহেরবান তা হলে করবে কী! ঘর সামলাবে না বাহির সামলাবে! বৌ রাখবে না চাকরি রাখবে! সুরযভানের তেমন কোনো সমস্যা নেই। তাকে দেখলে মনে হয় সে একটা স্থিতি পেয়েছে। সে রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখেছিল, রাজপুত্র পেয়েছে। কিন্তু মেহেরবান কি এই চেয়েছিল! এই স্বপ্ন দেখেছিল!

আমাকে ডাক পড়ল এমন সময় আজমীরে। পরামর্শ দিতে।

ওরা বিয়ে করেছে শুনে আমি সত্যি খুব খুশি হয়েছিলুম। আমি মুসলমান, আমার তেমন কোনো সংস্কার ছিল না। মেহেরবান রাগ করবে বলে আমি ওকে সে পরামর্শ প্রথম থেকে দিইনি। এখন সে আমার বিনা পরামর্শে যা করেছে তা ঠিকই করেছে। কিন্তু এই ঈর্ষা-কাতরতার অর্থ আমি বুঝিনে। এই সন্দেহকাতরতার। যার সঙ্গে সারা জীবন ঘর করবে তাকে পদে পদে অবিশ্বাস করলে চলে?

এর উত্তরে মেহেরবান বলে, "ও যে ভয়ানক সুন্দর। সুন্দর না হলে সন্দেহ করতুম না। কুৎসিত হলে বিশ্বাস করা সহজ হতো।"

বোঝা গেল সৌন্দর্যকেই তার ভয়। এ ভয় কিসে ভাঙবে? সাত আটটা সন্তান হলে? দুশ্চিকিৎস্য স্ত্রীরোগে ভুগলে? যৌবন অপগত হলে? কিন্তু এসবের তখন অনেক দেরি। সুরযভান আমাদেরই সমবয়সী। অকালে স্থবির হতে তার কিছুমাত্র ত্বরা ছিল না।

আমি বললুম, "ভাই, যাই করো স্ত্রীর কুরূপ কামনা কোরো না। তোমাদের কোনো দেবতা যদি তোমার প্রার্থনা পূরণ করেন তখন ভুগতে হবে তোমাকেই।"

দেখলুম ওর মতিগতি সুবিধের নয়। য়্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে বিশ্রী করা যায় কি না ভাবছিল। এমনভাবে ঘটাবে যেন একটা আকস্মিক ঘটনা। আমি কড়া গলায় শাসিয়ে দিলুম। তলে তলে শিউরে উঠলুম। বললুম, "তা হলে তুমি তালাক দাও। নয়তো ছাড়াছাড়ি করো।"

সে ও কথা কানে তুলবে না। বলবে, "পুলিশের চাকরিতে থাকলে মাইনে ও পেনসন মিলিয়ে আমি কয়েক লাখ টাকা কামাতে পারতুম। খরচ খরচা বাদ দিলে আমার নীট সঞ্চয় হতো এক লাখ টাকা। সেই লাখ টাকা আমি বলতে গেলে যৌতুক দিয়েছি। মোফত নিইনি। তবে কেন আমি তালাক দেব? আর ছাড়াছাড়ি কিসের? নিয়তি আমাদের একসূত্রে গেঁথেছে।"

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বললুম, "আচ্ছা, ও যদি তোমায় লাখ টাকা ফেরৎ দিত তুমি ওকে ছাড়ন দিতে?"

মেহেরবান একদম থ' বনে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। কী ভাবল ওই জানে! বলল, "ঠাট্টা করছ?"

"না। ঠাট্টা নয়।" আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললুম, "এই একমাত্র সমাধান।"

"তুমি যদি ওকে ও কথা বলো" মেহেরবান আর্ত কণ্ঠে বলল, "ও সত্যি সত্যি লাখ টাকা ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তা হলে আমিই ওর কাছে কেনা হয়ে থাকব। রানীপসন্দ্।"

ওর মনের কথাটা এই যে, সুরযভান ওর মালিক হবে না। ওই হবে সুরযভানের মালিক। তার পর সুরযভান সুন্দরী নায়িকা হবে না। হবে কুরূপা বধূ। তা হলেই ও নিশ্চিন্ত হবে, নিরুপদ্রব হবে। কিন্তু সুরযভানকে সেকথা মুখ ফুটে জানানো যায় না।

খাজা সাহেবের দরগায় নজরানা দিয়ে চেরাগ দিয়ে আমি আজমীর থেকে চলে আসি। তার কিছু দিন পরে অবাক হয়ে দেখি যে সুরযভানের বাড়ী আলো দিয়ে সাজানো। কী হয়েছে? কী হয়েছে? রানী ফিরে এসেছেন। আর কেউ সঙ্গে এসেছে কি? না, আর কেউ তো আসেনি।

৪

খান্ বাহাদুর বলতে লাগলেন।

"তার পরে মেহেরবানের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। চিঠি লেখালেখিও হয়নি। পাঞ্জাব থেকে আমি বাংলা দেশে বদলি হই। বদলি হই ঠিক নয়, গোপনীয় বিভাগে নিযুক্ত হই। তার পর থেকে এই প্রদেশে আছি। আমি যত দূর জানি এই শেষ।"

"এই শেষ!" আমার কৌতূহল নিবৃত্ত হতে চায় না। "বলুন, বলুন, তার পরে কী হলো? সুরযভানের কী হলো? মেহেরবানের কী হলো?"

লঞ্চ জল কেটে কেটে চলছিল। জলের ছিটে উড়ে এসে লাগছিল আমাদের গায়ে। কখন এক সময় চা পান সারা হয়েছে। ডিনারের অর্ডার দিয়েছি আমি। খান্ বাহাদুর আমার মেহমান।

"আর, দাদা! বলে সুখ নেই। মানুষ চিনতে চিনতে বুড়ো হয়ে গেলুম। কিন্তু তখন তো চিনতুম না। তাই স্তম্ভিত হয়েছিলুম।"

"কেন? কেন?" আমার কৌতূহল বাগ মানছিল না।

"লোকটা সত্যি সত্যি গিয়েছিল স্ত্রীর মুখে য্যাসিড ঢালতে। এক ফোঁটা পড়েছিল তার গালে কি ঘাড়ে। সেইজন্যে স্বরযভান আর পার্টি দেয় না। বেরোয় না। কিন্তু খুব বেশী ক্ষতি হয়নি। স্বরযভানের সঙ্গে লাখ খানেক টাকার জহরৎ ছিল। সমস্ত মেহেরবানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে এক দৌড়ে রেল স্টেশনে হাজির হলো। তার পর সটান শিয়ালকোট।"

আমি ঘেন্নায় কানে হাত দিয়েছিলুম। আর শুনতে রুচি ছিল না।

"মেহেরবান তো জহরৎ সামলাতে ব্যস্ত। তাড়া করে যাবে কী করে? কোনটা বেশী মূল্যবান? জহরৎ না আওরৎ? কার্যকালে দেখা গেল, জহরৎ।" খান্ বাহাদুর খেদোক্তি করলেন। মনে হলো তাঁর সহানুভূতি আওরতের প্রতি। হাতটা একটু ফাঁক করলুম।

কিন্তু সেটা আমার ভুল।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। পৌঁছতে দেরি আছে। খানারও দেরি। গল্পটা শেষ হয়ে গেলে কী নিয়ে আমরা থাকব? কান থেকে হাত সরিয়ে নিলুম।

খান্ বাহাদুর বললেন, "ও ঠিকই হয়েছে, মশায়। অল্পের উপর দিয়ে গেছে। ঘটনা তো এই একটা দেখলুম না। মেহেরবান একদিন ওকে খুন করতে পারত। সুন্দরীরা চঞ্চলা হয়েই থাকে। একদিন হয়তো একটু চনমন করত আর অমনি জানটা হারাত। বেঁচে গেছে এই ঢের। য্যাসিডের দাগ লেগে সৌন্দর্যের যদি বা একটু হানি হয়ে থাকে সেটা মনে করুন, ওর পাপের সাজা।"

আমি কথাটি কইলুম না। পাপতত্ত্বে আমার আস্থা ছিল না। পাপের সাজা আবার পাপীতে দেবে, এটাও আমার অসহ্য। মেহেরবানও তো কম পাপী নয়।

"বিচার করে দেখবেন," খান্ বাহাদুর বলতে লাগলেন, "নারীর কী এমন ক্ষতি হলো! ক্ষতি যা হলো তা পুরুষের। ঐ জহরৎ কি তার ক্ষতিপূরণ নাকি! সে ক্ষতি অপূরণীয়। চাকরিতে থাকলে সে এতদিনে ডি আই জি না হোক এ আই জি হতো। হায়, হায় রে তকদির! নসীবে যা আছে তাই তো হবে। আর ঐ রেলওয়ের কাজটাও রাখতে পারল কই! লাখ টাকার জহরৎ পেয়ে মাথা ঘুরে গেল। সাদী করে বসল ঐ জহরৎ যৌতুক দিয়ে। রাজপুতানার মহা সম্ভ্রান্ত সরদার পরিবারে। ওঁরা ওকে ইংরেজের নোকরি করতে দিলেন না। দেশীয় রাজ্যের ফৌজে ভর্তি করে দিলেন। তাতে পদ ছাড়া আর কী আছে, মশায়!"

আমি গুম হয়ে বসেছিলুম। কী বলব ভেবে পাচ্ছিলুম না।

"এখন আমাদের ইন্স্পেকটারের কী হয় দেখা যাক। ইনি আর এক রানীপসন্দ্। মেয়েটি নাকি অপরূপ সুন্দরী। সুন্দরী হলে মন্দ হবে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে! যে যত মন্দ সে তত সুন্দর।" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন খান্ বাহাদুর।

(১৯৫৩)

নারীচরিত্র পুরুষভাগ্য

১

আমার বন্ধু কুশল আর্ট স্কুল থেকে বেরিয়ে সোজা বিলেতে চলে যায়। সেখানে তার কে একজন সাহেব মুরুব্বি ছিলেন। তিনি তাকে রয়াল কলেজে ভর্তি হতে সাহায্য করেন। তার দু'বছর পরে আমিও বিলেত যাই। গিয়ে দেখি কুশল তার ছবির প্রদর্শনী করেছে। আদর মন্দ হচ্ছে না। সমঝদারদের সমাগম হচ্ছে। তাঁরা আর কিছু করুন না করুন পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলছেন, "বেশ। বেশ। একটা নতুন অভিজ্ঞতা হলো।"

ভীষণ ইংরেজভক্ত। ওরা যেমন আর্ট বোঝে তেমন নাকি আর কেউ বোঝে না। মানে অত দাম দিয়ে কেনে না। ওদের কল্যাণে কুশল এখন পরম স্বচ্ছন্দে আছে। টাকার টানাটানি নেই। চেলসী অঞ্চলে সার্ভিস রুমস নিয়েছে। স্টুডিও তার সামিল। ভারতীয়দের সঙ্গে বড় একটা মেশে না। আমার সঙ্গে মেশে আমি ভারতীয় বলে নয়। আমি সিভিলিয়ান বলে।

সে যে একজন শিল্পী এটা তার চেহারায় লেখা। পোশাকেও। বড় বড় জলজলে দুটো চোখ। মাথাটাও বড়। আরো বড় দেখায় এক রাশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের দরুন। গলায় নেকটাই বাঁধে না। বাঁধে ক্র্যাভাট। তার কোটের ঝুল বেশ একটু লম্বা। হঠাৎ মনে হয় ওভারকোট নয় তো! তার পায়ের জুতোরও বিশেষত্ব ছিল। ফিতে বাঁধা সাধারণ জুতো নয়। বুটিদার বা বোতামদার জুতো।

আমার সঙ্গে ওর অনেক দিনের আলাপ। ও যখন গান্ধীভক্ত ছিল তখন থেকেই। কেই বা জানত ইংলণ্ডের মাটিতে সাহেব সেজে আমাদের দু'জনের দিন কাটবে। আলাপটা ঝালিয়ে নিতে সময় লাগল না। প্রায়ই আমাদের দেখা হতো থিয়েটারল্যাণ্ডে। হয় আমি ওর জন্যে টিকিট কিনতুম, নয় ও কিনত আমার জন্যে। হিসেব করলে ওর ভাগটাই বেশি।

কুশলকে আমি একদিন পরিহাস করে বলেছিলুম, "ভদ্রমহিলাটি কে বলো তো? সমস্তক্ষণ তোমার দিকে দৃষ্টি। তুমিই কি অভিনেতা? তোমাকেই দেখতে থিয়েটারে আসা? স্টেজের উপর কী ঘটছে না ঘটছে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই।"

কুশল গম্ভীরভাবে বলেছিল, "কেন যে এরা এদেশে আসে! ভারতবর্ষের কালো ধূমসী মেয়ে। দেশ থেকে এরা আমাদের তাড়া করে এসেছে বলে কি আমরা এদের ধরা দেব!"

মেয়েটি কালোও নয়, ধূমসীও নয়। কিন্তু আমার খেয়াল ছিল না যে কুশল ইংলণ্ডে এসেছে আমার দু'বছর আগে। তাই ওর চোখে মলিনকে কালো দেখায়, মাংসলকে মোটা দেখায়। আমি একটু রাগ করে বলেছিলুম, "তা হলে তোমার মতলবটা কী? ইংরেজ বিয়ে করা?"

"উঁহু। ইংরেজ নয়। এ দেশের লালমুখো মেয়েদের দেখলে জীববিশেষকে মনে পড়ে।" কুশল বলেছিল বিরস মুখে।

"তা হলে কী? ফরাসী?"

"ফরাসী?" সে নাসিকা কুঞ্চিত করে বলেছিল, "নাকে দেবার রুমাল অত কোথায় পাব!"

তার পর একে একে নানা দেশের নারীর প্রসঙ্গ ওঠে। কুশল যেসব

মন্তব্য করে সে সব অত্যন্ত অভদ্র ও মানহানিকর। আমি তাকে শাসিয়ে দিয়ে বলি, "এর পরিণাম ভালো হবে না, কুশল। নারীজাতি এর প্রতিশোধ নেবে। তুমি এমন কী সুপুরুষ যে নারসিসাসের মতো নিজেরই প্রেমে পড়বে!"

ও এমন ভাব দেখায় যেন নারসিসাসের মতো নয়, অরফিউসের মতো ওর কপাল। মেয়েরা ওকে ফুলের মতো কুটি কুটি করে ছিঁড়বে। ও জাতটাকেই ওর ভয়।

"ওরা দশমহাবিদ্যা। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে একটা পট ছিল। রোজ দেখতুম। কী ভয়ঙ্কর!" শিশুর মতো ভীত হয়ে বলে কুশল।

"প্রত্যেকটি?" রহস্য করি আমি।

"প্রত্যেকটি।" রহস্য বোঝে না কুশল। গম্ভীরভাবে বলে, "কমলার কাজ হলো গজ গিলে খাওয়া। মানুষকে যদি গিলে না খায় তো চিবিয়ে খাবে। ওদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ তার এই স্বভাব। আর তোমার ঐ ধূমাবতী—"

তথাকথিত কালো ধূমসী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আমি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠি। আর ও প্রসঙ্গ নয়। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্।

মাস কয়েক পরে গরমের বন্ধে কুশল প্রস্তাব করল, "চলো, ইটালী যাওয়া যাক। সমস্ত দেশটাই একটা চিত্রশালা। কেবল ছবি দেখব আর ছবি আঁকব।"

আমি বললুম, "কিন্তু আমি যে জার্মানী অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি যাচ্ছি। এ যাত্রা ইটালী নয়।"

সে একবার বলল আমার সঙ্গে যাবে, একবার বলল কোথাও গিয়ে কাজ নেই। কিন্তু গেল শেষ পর্যন্ত ইটালী। তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হলো প্যারিসে। বলল, "ফিরে এসে লেগে যেতে হবে আর একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করতে। নইলে খরচ উঠবে কী করে?"

তার পর অনেক ঘোরাফেরা করে আমি যখন লণ্ডনে ফিরি কুশল তখনো ফেরেনি। আমার জন্যে অপেক্ষা করছে তার চিঠি। তাতে সে লিখেছে, "আমার বড্ড ভয় করছে। তুমি কাছে থাকলে অভয় দিতে। অতএব তুমি এসো। আমি ভয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। এইসঙ্গে কয়েকটা স্কেচ পাঠাচ্ছি। দেখো। কী ভয়াবহ!"

প্রেমে পড়ার মতো রূপ বটে। লুভর মিউজিয়ামে দেখেছিলুম দা ভিঞ্চির লা বেল ফেরোনিয়ের। কতকটা সেই রকম দেখতে। প্যারিস থেকে পাঠালে ঠাওরাতুম নকল করে পাঠিয়েছে। তা নয়। পাঠিয়েছে ফ্লোরেন্স থেকে। ছবির নকল নয়। জীবনের ছবি।

এই চিঠির উত্তর দিতে না দিতে শুনি কুশল আমাকে টেলিফোনে ডাকছে। আরে, আরে, কুশল নাকি? কুশল তো? হাঁ, কুশল। একটা খবর দেবার আছে। ভয়ের সঙ্গে বাস করতে করতে ভয়কে জয় করেছে। তার মানে? তার মানে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে। বোঝা গেল লোকটা কেবল চিত্রকুশল নয়, কর্মকুশলও বটে।

ছুটতে হলো চেলসী। সময় ছিল না, টাকাও ছিল না উপহার কিনতে। আফসোস শুনে কুশল বলল, "বৌভাত হবে পিনোলি'তে। ফ্রাস্কাটিতে করতে চেয়েছিলুম। ওরা জায়গা দিতে পারল না। অন্য দিন ফেলতে আমরাও অক্ষম। লিস্ট দেখবে? কাকে কাকে রিসেপশনে ডাকছি?"

প্রকাণ্ড তালিকা। হংসো মধ্যে বকো যথা গুটি তিন চার ভারতীয়। আমি বললুম, "তুমি নিজেই বলেছ এটা বৌভাত। তা হলে বরপক্ষের লোকদের নেমন্তন্ন করতে হয়। আমরা ভারতীয়রাই বরপক্ষ। অথচ আমাদেরই সংখ্যা কম। কাটো, কাটো, কন্যাপক্ষের নাম কাটো।"

একটা আপোস হলো। কুশল একেবারে অন্য মানুষ। সে যেন দুনিয়ার লোককে ডেকে দেখাতে চায় তার বৌভাগ্য। ভারতীয়রাও এসে দেখুক, দেখে হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরুক। কালো ধূমসী মেয়েরাও আসুক। এসে হিংসায় বুক ফেটে মারা যাক।

লেওনার্দোর লা বেল ফেরোনিয়ের সশরীরে উপস্থিত আমার সম্মুখে। উপস্থিত নয়, উদয়। আমি হতচকিত হয়ে অভিবাদন করতে ভুলে গেলুম। মহাভাগ্যবান আমার বন্ধু। বন্ধুর ভাগ্যে আমিও ভাগ্যবান। ওরা সুখী হোক, সার্থক হোক, অন্তর থেকে উঠছিল এই প্রার্থনা। ওদের মঙ্গল হোক, ওদের উপর বিধাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, এ ছাড়া আর কী বলতে পারি! ঈশ্বর আছেন কি না তাই নিশ্চিতরূপে জানিনে, তবু একটা দিনের জন্যে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য হয়ে উঠলুম।

কুশলকে বললুম, "ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। এসো তিনজনে মিলে উপাসনা করি।"

"জানো না বুঝি!" সে কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, "আমি রোমান ক্যাথলিক হয়েছি।"

দারুণ আঘাত পেলুম। সে যদি মনে প্রাণে রোমান ক্যাথলিক হতো তা হলে আমার কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু বিবাহের জন্যে ধর্মান্তর গ্রহণ কোনো মতেই সমর্থন করা যায় না। আমি তো এটাও চাইনে যে লা বেল হিন্দু হোক। আড়ালে ডেকে নিয়ে এসব কথা শুনিয়ে

দেওয়ায় কুশল বলল, "আমাদের দু'জনেরই সাধ যায় সন্তানের মুখ দেখতে। সন্তান হলে তার কোন্ ধর্ম হবে? হিন্দুরা কি কোনো দিন তাকে হিন্দু বলে স্বীকার করবে? অথচ ক্যাথলিকরা তাকে মাথায় তুলে নেবে।"

তার পর সে তার প্রেমের ইতিকথা বিবৃত করল।

ফ্লোরেন্সের উফিৎসি গ্যালেরিতে গিয়ে ছবি দেখা ও ছবির মধ্যে মনের মতো কিছু পেলে টুকে নেওয়া তার নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাঝে মাঝে পিত্তি গ্যালেরিতেও যেত। চিত্রিতের স্কেচ নিতে নিতে কখন এক সময় আনমনে জীবন্তের স্কেচ নিতে শুরু করে দিয়েছে, টের পায় যখন মেয়েটি একটু মিষ্টি হেসে সরে যায়।

রোজ এই খেলা। গ্যালেরিতে ঘুরতে ঘুরতে কখন এক সময় দু'জনে দু'জনের অভিমুখে আসবেই। কেউ কাউকে চেনে না। কেউ কারো ঠিকানা জানে না। কথাও বলে না কেউ কারো সঙ্গে। কাল যে আবার দেখা হবে এমন কোনো প্রতিশ্রুতিও নেই। কোন গ্যালেরিতে দেখা হবে —উফিৎসিতে না পিত্তিতে—তাই বা কে কাকে বলে রাখছে! দেখা তবু হবেই। কুশল যেখানে দাঁড়িয়ে স্কেচ করছে গ্রাৎসিয়া সেখানকার আশে পাশে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে ছবি দেখবে। আর তার সেই তন্ময়তার স্কেচ তুলে নেবে কুশল। তার পর মধুর হেসে সরে যাবে গ্রাৎসিয়া। কুশলের ধ্যানভঙ্গ হবে।

এমনি করে তাদের পরিচয়। এর পরের অধ্যায় আলাপ। কুশল ইতিমধ্যে ইটালিয়ান ভাষায় কতকটা অগ্রসর হয়েছিল। মেয়েটি ইংরেজী বুঝত, যদিও বলতে জানত না ইংরেজী! প্রেমের রাজ্যে ভাষার অভাব হয় না। প্রেমই তো সে রাজ্যের রাজভাষা। ফ্লোরেন্স থেকে

তারা পালিয়ে যায় রোমে, সেখানে, লুকিয়ে বিয়ে করে। বিয়ের পর মধুমাস কাটাবে ইটালিয়ান রিভেয়েরায়, এই রকম ঠিক ছিল। হঠাৎ পুলিশ এসে রসভঙ্গ করে! মোটা রকম ঘুষ দিয়ে দেশত্যাগের অনুমতি পায় দু'জনে। ব্রিটিশ পাসপোর্ট পেতে একটু যা বিলম্ব হয়েছিল গ্রাৎসিয়ার। ব্রিটিশ রাজদূত কুশলকে আগে থেকে চিনতেন। তাঁকেও খানকয়েক ছবি উপহার দিতে হয়েছিল। দূতাবাস সাজাবার জন্যে।

২

মল্লিকরা চেলসী থেকে উঠে যায় আরো দক্ষিণে। পাটনীতে। সেখানে তাদের আলাদা একটা ফ্ল্যাট। মাস কয়েক পরে আমিও বাসাবদল করি। বেলসাইজ পার্ক থেকে গোলডার্স গ্রীন। আরো উত্তর-পশ্চিমে। সেখানে গার্ডন সাবার্বের নিরিবিলি।

আমাদের মাঝখানের দূরত্ব বেড়ে যায়। দূরত্ব শুধু ভৌগোলিক নয়। একজন বিবাহিত, আর একজন অবিবাহিত। অবসর সময়টা সে স্ত্রীর সঙ্গে কাটাবে, দু'জনে মিলে বেড়াতে বেরোবে, থিয়েটারে সিনেমায় যাবে। এই তো স্বাভাবিক। কেনই বা সে আমার জন্যে টিকিট কিনবে! আমিই বা কোন ধনকুবের যে তাদের উভয়ের জন্যে টিকিট কিনব!

আমাদের দেখাশোনা কমতে কমতে থেমে যায়। কদাচ এক আধবার টেলিফোনে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়। চিঠি লিখতে কুঁড়েমি করি সে ও আমি দু'পক্ষই।

গরমের বন্ধে আবার আমি কন্টিনেণ্ট চলে যাই। মাত্র কয়েক দিনের জন্যে লণ্ডনে ফিরি মালপত্র জাহাজে পাঠিয়ে দিয়ে স্বয়ং ইটালী ও দক্ষিণ ফ্রান্স ঘুরে মার্সেইতে জাহাজ ধরতে। বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে বিদায়

নেবার কথা মনে হতেই কুশলের নাম মনে পড়ল। টেলিফোন করে দিন ফেলা গেল। টেট গ্যালেরিতে মিলব, সেখান থেকে একসঙ্গে ওর বাসায় যাব। সন্ধ্যাবেলাটা ওদের সঙ্গে কাটাব।

টেট গ্যালেরিতে কুশল অপেক্ষা করছিল। মুখে পাইপ। ভালো দরজিকে দিয়ে পোশাক কাটাই। ভালো নাপিতকে দিয়ে চুল ছাঁটাই। একজন তৃপ্ত স্বামী ও সম্পন্ন গৃহস্থ। গর্বিত পিতাও বটে। দু'মাস আগে তার একটি খোকা হয়েছে। অবিকল বাপের মতো দেখতে। কেবল চোখ দুটি তার মায়ের।

"এবারকার প্রদর্শনীটা তুমি দেখতে পেলে না। হাইলি সাকসেস্ফুল।" কুশল বলল চিবিয়ে চিবিয়ে। "সার মিউয়ারহেড বোন তো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। ডিনারের নিমন্ত্রণ সামনের শনিবার। গ্রাৎসিয়াকেও নিয়ে যেতে বলেছেন।"

আমি অভিনন্দন জানালুম নন্দনের জন্যেও বটে, সাফল্যের জন্যেও বটে। পরিহাস করে বললুম "সেটিও তো একটি ওয়ার্ক অফ আর্ট।"

"নেহাৎ মিথ্যা বলনি। সেটিও তো একটি ওয়ার্ক অফ আর্ট। তবে একার নয়। আমার চেয়ে গ্রাৎসিয়ার কৃতিত্ব বেশি। প্রদর্শনীতে পাঠাবার মতো বেবী।"

দোতালায় ফ্ল্যাট। বেল টিপতেই নার্স ছুটে এসে দোর খুলে দিল। কুশল জিজ্ঞাসা করল, "বেবী কেমন আছে?"

"ফাইন। এখন ঘুমোচ্ছে।" উত্তর দিল নার্স। ছুটে ফিরে গেল নার্সারিতে।

এমন সময় আমাদের কানে এলো গ্রাৎসিয়া কথা বলছে ইটালিয়ান

ভাষায় কোনো একজন পুরুষের সঙ্গে, সেও কথা বলছে ইটালিয়ান ভাষায়। সে কী উল্লাস, কী অন্তরঙ্গতা, কী প্রাণচাঞ্চল্য!

থমকে দাঁড়ালো কুশল। বসবার ঘরে ঢুকবে কি না ভেবে দেখল। আমি তো ইটালিয়ান একবিন্দু বুঝিনে। তবু আমারো কেমন যেন খটকা বাধল। কুশলের দিকে তাকিয়ে বিমূঢ় হলুম। ভয়, ঈর্ষা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, ক্রোধ, তাচ্ছিল্য কত রকম মনোভাব যে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল আয়নায়। সে কয়েকবার মেজেতে পা ঠুকে আওয়াজ করল। তাতেও চৈতন্য হয় না। গম্ভীরকণ্ঠে ডাকল, "নার্স।"

নার্স আসতেই বলল, "ইনি আমার বন্ধু। বেবীকে দেখতে এসেছেন। চলো, আমরা আগে ও কাজটা সেরে আসি।"

আহা, কী সুন্দর ফুটফুটে খোকা! রংটা বাপের মতো। তা নইলে অবিকল মায়ের মতো দেখতে। এ যখন বড় হয়ে বাংলাদেশে যাবে তখন একে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়বে আত্মীয় মহলে। কার মনে থাকবে যে এ রোমান ক্যাথলিক! তারপর যখন আরো বড় হবে তখন কাড়াকাড়ি পড়বে তরুণী মহলে। হিন্দুর মেয়েরাই স্বয়ংবরা হতে চাইবে। আমি তার নাম রাখলুম "অনিন্দ্য।"

তখনো কানে আসছিল গ্রাৎসিয়ার সঙ্গে সেই আগন্তুক ভদ্রলোকের অফুরন্ত বাক্যালাপ। কুশল অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠছিল। ছেলেকে ছাড়তে চায় না, তবু মন পড়ে আছে স্ত্রীর কাছে। আমাকে টেনে নিয়ে বলল, "চলো, ও ঘরে যাই। অভদ্রতা হবে। তা কী করা যায়!"

"ভিতরে আসতে পারি কি?" বলে সে উত্তরের জন্যে সবুর না করে ঢুকে পড়ল। আমি কী আর করি? একটু ইতস্তত করে আমিও তার অনুসরণ করলুম।

মধ্যবয়সী ভারিক্কি মতন ভদ্রলোক। গ্রাৎসিয়া তাঁর হাতে হাত রেখে বসেছিল। কুশলকে দেখে লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো। “কখন এলে? কই, টের পাইনি তো? এসো, আলাপ করিয়ে দিই।”

এর পরে সে যা বলল তা শুনে কুশলের হাঁটুজোড়া থর থর করে কাঁপতে লাগল, সে ধপ করে একটা চেয়ারের বাহুর উপর বসে পড়ল, তারপর গড়িয়ে পড়ল সীটে। আমি আসন নিয়ে ভাবতে থাকলুম এ কী দৃশ্যের সাক্ষী হতে এলুম আমি। এ কোন্ নাটক!

গ্রাৎসিয়া বলল, “ইনি আমার স্বামী কুশল। আর ইনি আমার স্বামী জোভানি।”

তার মুখে হাসি ধরে না। সে যে কী প্রচণ্ড খুশি হয়েছে এতকাল পরে জোভানিকে পেয়ে তা সে একটুও গোপন করে না। আবার এটাও সমান স্বচ্ছ যে কুশল বাড়ী ফিরেছে বলে তার আনন্দের সীমা নেই। সে একবার কুশলের কাছে এসে জুতো খুলে নেয়, চটি পরিয়ে দেয়। একবার জোভানির কাছে গিয়ে ছোট কাঁচি দিয়ে কানের চুল কাটে। তার সরল বিশ্বাস সে যেমন সুখী কুশল তেমনি সুখী, জোভানিও তেমনি সুখী। আমি যে একজন উপস্থিত আছি আমাকে লক্ষ্যই করে না।

কুশল একেবারে বোবা বনে যায়। সে যে কী চিন্তা করছে ভগবান জানেন। আদৌ চিন্তা করছে কি না বোঝা যায় না। আমি তার জন্যে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। খুন টুন করে বসবে না তো। যদি আত্মঘাতী হয়! কিন্তু বেশীক্ষণ তার উপর নজর রাখতে পারছিলুম না। আমি সাক্ষী। আমাকে দৃষ্টি রাখতে হবে গ্রাৎসিয়ার উপরে, জোভানির উপরে। প্রত্যেকের উপরে।

জোভানি আমার কাছে সরে এসে ধীরে ধীরে আলাপ জমালেন। ইংরেজী বলতে পারেন। তবে উচ্চারণটা ইতালীয়। বললেন, “আমার মনে হচ্ছে আপনি মিস্টার মল্লিকের বন্ধু। আমি সত্যি খুব দুঃখিত। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু এক বছর ধরে খুঁজতে খুঁজতে এতকাল পরে আমি আমার নিরুদ্দিষ্টা পত্নীর সন্ধান পেয়েছি।”

তারপর তিনি যা বললেন তা যেমন দীর্ঘ তেমনি করুণ। কুশল শুনছিল কি না জানিনে। আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলুম।

৩

জোভানির জীবনের উচ্চাভিলাষ ছিল দুটি। ধনের উপাসনা করে ধনবান হতে হবে। ধনের উপচার দিয়ে রূপভোগ করতে হবে। ভাগ্যবান তিনি, তাঁর দুটি উচ্চাভিলাষের কোনোটি অপূর্ণ ছিল না। জহরতের ব্যবসা করে তিনি ঐশ্বর্যের মুখ দেখেছিলেন, আর ঐশ্বর্যের বিনিময়ে রূপসীদের প্রসাদ লাভ করেছিলেন। হাঁ, তিনি ছিলেন দুই অর্থে জহুরী।

যৌবনের আর বেশী দিন অবশিষ্ট নেই, ভোগসামর্থ্যে ভাঁটা পড়তে যাচ্ছে, এমন সময় তাঁর খেয়াল গেল বিয়ে করতে। চল্লিশ একচল্লিশ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করে বসলেন ষোলো সতেরো বছর বয়সের নবীনা কিশোরী গ্রাৎসিয়াকে। রূপে অদ্বিতীয়া, কাঞ্চনকৌলীন্যে হীন। তার জন্যে দোকান উজাড় করে উপহার জোগাতে হয়েছিল, তা সত্ত্বেও তার মন ভেজেনি। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে প্রথমে কিনতে হলো তার গুরুজনের সম্মতি, তার পরে তার পাণিপ্রার্থী তরুণদের অপসরণ।

তাদের মধ্যে একজনকে সে ভালোবাসত। সে ছেলেটি চলে গেল জোভানির দেওয়া যৌতুক নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায়।

জোভানির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে উপায়ে গ্রাৎসিয়ার হাত পাওয়া গেছে সেই একই উপায়ে তার হৃদয় পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ঐশ্বর্যের বিনিময়ে। কিন্তু তার রোমিওকে হারিয়ে সে এমন মন-মরা হয়ে রইল যে বহুমূল্য বেশভূষা ও দুর্লভ মণিমাণিক্য দিয়ে তার হৃদয় ক্রয় করা গেল না। সময়ের উপর ছেড়ে দাও, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে, পরামর্শ দিলেন বন্ধু ও বয়স্যেরা। জোভানি তাই করলেন। রৌপ্যের আরাধনায় একান্তভাবে মগ্ন হয়ে রূপসম্ভোগে যথাসম্ভব বিরত হলেন।

ওদিকে গ্রাৎসিয়ার শখ হলো শিল্পীদের ডেকে তার ছবি আঁকিয়ে নেওয়া। একজনের পর একজন আসে আর তাকে একটি বিশিষ্ট রূপে ও বিশিষ্ট ভাবে অমর করে দিয়ে যায়। আমি তো থাকব না, এই ছবি থাকবে আমার রূপলাবণ্য নিয়ে। এই ছবির মধ্যে আমিও থাকব। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিত গ্রাৎসিয়া। এমন কিছু অন্যায় উত্তর নয়, তাই বাধা দিতেন না জোভানি। শিল্পীরা ছবির জন্যে যা চাইত তা অতি সামান্য অর্থ, অনেক সময় তা ও চাইত না। বলত, ছবি যদি অমর হয় তবে ছবিকারও কি অমর হবে না? যে অমরত্বের সুযোগ পেয়েছে সে আর কিছু চাইতে পারে না।

জোভানির সংশয়ী মন শিল্পীদের উপর কড়া নজর রাখত। কিন্তু তেমন কোনো অঘটন ঘটেনি। ঘটলে জানা যেত। গ্রাৎসিয়া তেমন মেয়েই নয়। সে স্বভাবত বিশ্বাসী। সেইজন্যে জোভানি তাকে অপরের তুলনায় অনেক বেশী স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আর সেও তার স্বাধীনতা নিয়ে সৌন্দর্যচর্চাই করেছিল। উচ্ছৃঙ্খলতা করেনি।

প্রথম সন্তান হলো মেয়ে, কিন্তু দেখতে মায়ের মতো সুন্দরী নয়। তাতে গ্রাৎসিয়ার মন খারাপ হয়ে যায়। তার পর শিল্পীরা ঠিক আগের মতো উৎসাহের সঙ্গে ছবি আঁকতে আসে না। এলে টাকাকড়ি চায়। তা হলে কি সে কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে? তার মাথায় সেই যে পোকা ঢুকল তখন থেকে পোকার উপদ্রব থামল না, কমল না, বেড়েই চলল। ছবি আঁকিয়ে নেবার জন্যে সে আরো উন্মনা হলো, আরো সময় দিল, আরো খরচ করল। কিন্তু ছবি যদি অমর না হয় শিল্পীরা তো অমর হবে না। কেন তবে তারা বেগার খাটবে! তারা যতটা পারে আদায় করে নেবে। আদায় কেবল এক অর্থে নয়, অপর অর্থেও।

এইবার স্বামীস্ত্রীর মাঝখানে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হলো। এটা এমন একটা নেশা যে এর জন্যে গ্রাৎসিয়া অনেক কিছু দিতে উদ্যত। জোভানির তাতে আপত্তি। এক দিন এই নিয়ে রাগারাগি হয়ে গেল। পরের দিন গ্রাৎসিয়া নিখোঁজ। অনেক কষ্টে তার সন্ধান পাওয়া যায় সিয়েনার কাছে এক গ্রামে। সেখানে তার ছবি আঁকছিল এক শিল্পী। ধর্মের দোহাই দিয়ে, মা মেরীর দোহাই দিয়ে অবশেষে তাকে ফিরিয়ে আনা গেল। কিন্তু তার মন লাগল না সংসারে। জোভানি খুব খরচপত্র করে শিল্পী ধরে নিয়ে এলেন ঘরে। কিন্তু গ্রাৎসিয়া তেমন শিল্পীর সামনে পাঁচ মিনিটও বসবে না। সিয়েনার কাছে সেই যে গ্রাম, সেখান থেকে সেই যে শিল্পী সে যদি আসত তা হলে বসত।

এর পরে আর একটি সন্তান হয়। এটিও মেয়ে। এটিও মায়ের মতো সুরূপা নয়। বাপের মতো দেখতে। তার জন্মের সময় গ্রাৎসিয়ার প্রাণসংশয় হয়েছিল। যদি বা কোনো মতে প্রাণ রক্ষা হলো মাথা গেল বিগড়ে। থেকে থেকে স্মৃতিভ্রংশ হয়। মনে থাকে না যে সে বিবাহিতা

মহিলা, দুটি শিশুর জননী। এমন ব্যবহার করে যেন জোভানি তার স্বামী নয়, স্বামীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে শিউরে ওঠে, থরথর করে কাঁপে, পালাতে চায়। কেমন করে তার ধারণা জন্মাল সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, তার রূপলাবণ্যের মহিমা অস্তগামী হতে চলল, তবু কেউ তাকে ভালোবেসে বিয়ে করল না, শ্রদ্ধা করে ছবি আঁকল না। আবার কখন নিখোঁজ হয় ভেবে জোভানি তাকে আগের মতো স্বাধীনতা দিতেন না, সেইজন্যে তার ভিতরে ভিতরে ক্ষোভ ছিল। গেল এক দিন কোন ফাঁকে নিরুদ্দেশ হয়ে।

অগত্যা খবর দিতে হলো পুলিশে। জানাতে হলো ওর স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। যাবার সময় বিশেষ কিছু সঙ্গে নেয়নি। থাকবে কোথায়, খাবে কী! ভাবনার কথা। দীর্ঘ কাল ধরে অন্বেষণ করতে করতে সম্প্রতি জোভানি সংবাদ পান যে গ্রাংসিয়া এখন ইংলণ্ডে বাস করছে। এখানে এসে যা শুনছেন তাতে তাঁর চমক লাগছে, তিনি স্তম্ভিত। তবু তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেনই। যা হবার তা হয়ে গেছে। তিনি ক্ষমা করলেন।

এখন আমার বন্ধু যদি দয়া করেন তা হলে গোলমালটা গোপনে গোপনে মিটে যায়। এর জন্যে কিছু খরচ করতেও তিনি প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। আজ এই মুহূর্তে আমার মধ্যস্থতায় নগদ দিয়ে যেতে রাজী। কালকের দিনটা ইংলণ্ডে থেকে পরের দিন ইটালী রওনা হবেন।

কী আশ্চর্য! আমিও তো সেইদিন রওনা হচ্ছি ইটালী।

তাই নাকি? তা হলে তো একসঙ্গে রওনা হওয়া যায়। অশেষ কৃতজ্ঞ থাকবেন, আনন্দের সঙ্গে আতিথেয়তা করবেন আমি যদি গরিবের

ঘরে পদার্পণ করি। আমরা হলুম রাজা মহারাজা, সামান্য জহুরী আমাদের কতটুকু যত্ন আত্তি করতে পারে!

আমি কুশলকে এর একটি কথাও জানালুম না। স্ত্রীর বিনিময়ে নিষ্ক্রয় নেবে তেমন পুরুষ সে নয়। হয়তো রিভলভার বার করে একটি গুলি চালিয়ে দেবে ভদ্রলোকের বুকে। কিংবা তার নিজের। সে তো আপনার জন্যে কিছুই হাতে রাখেনি। দু'হাত খালি করে দিয়েছে। বাপ পিতামহের ধর্ম পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছে। জহুরীর এমন কী জহরৎ আছে যা তার সমমূল্য!

গ্রাৎসিয়া ডিনার তৈরি করেছিল তিনজনের। আমি হঠাৎ উঠে গিয়ে রান্নাঘরে হাজির হলুম। কাজটা দুঃসাহসিক। সে হয়তো বিষম রাগ করবে। আর ওদিকে জোভানির সঙ্গে কুশলের বেধে যাবে ধ্বস্তাধ্বস্তি। বিস্তর মাফ চেয়ে গ্রাৎসিয়াকে বললুম, "বেবীকে দেখতে এসেছিলুম, সিন্যোরা। দেশে ফিরে যাচ্ছি কিনা। কী সুন্দর হয়েছে বেবী! অবিকল তার মায়ের মতো। শুধু রংটা তার বাপের।"

স্পাগেটি ও টোমাটো নাড়তে নাড়তে গ্রাৎসিয়া বলল, "আমার তো মনে হয় অবিকল তার বাপের মতো। ঠিক কুশলের মতো সুপুরুষ হবে। তেমনি মহাশিল্পী।"

তারপর কথাটা আস্তে আস্তে পাড়লুম। বললুম, "জোভানি আজ রাত্রে কোথায় থাকবেন?"

"কেন? এইখানে?" এমন প্রশ্ন উঠতে পারে ভেবে গালে হাত দিল গ্রাৎসিয়া।

"সেটা কি ঠিক হবে? কুশল যদি আপত্তি করে? যদি মন খারাপ করে?"

"কুশল করবে আপত্তি! কুশল করবে মন খারাপ!" গ্রাৎসিয়ার বিশ্বাস হলো না। সে বার বার মাথা নাড়ল। "জোভানি এক রাত্রি কেন সাত রাত্রি থাকতে পারে। কুশল কিছু মনে করবে না। মনে যদি কেউ করে তো সে জোভানি।"

গ্রাৎসিয়ার কাছে ব্যর্থ হয়ে জোভানির কাছে গেলুম। অনুরোধ করলুম তাঁকে রাতটা হোটেলে কাটাতে। তিনি বললেন, "আমি আজ পণ করে বেরিয়েছি স্ত্রীকে না নিয়ে হোটেলে ফিরব না। যত টাকা লাগে দেব। কিন্তু নিরাশ হব না।"

আমি রুষ্ট হয়ে বললুম, "কত টাকা আছে আপনার? কলকাতার মল্লিকদের চেয়ে বেশি? সিন্যর, আপনি কার বাড়ীতে বসে কথা বলছেন জানেন কি? একজন ইংরেজের গৃহ তার দুর্গ। আমার বন্ধু ইচ্ছা করলে আপনাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করতে পারেন।"

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। মার্জনা ভিক্ষা করে বললেন, "আমার বেয়াদবি হয়ে গেছে। শুধু একটিবার গ্রাৎসিয়ার দেখা পেতে পারি কি?"

গ্রাৎসিয়াকে ডাকতে হলো না। সে আমার গলা শুনে আপনি ছুটে এসেছিল, দরজার বাইরে কান পেতেছিল। ঘরে ঢুকে দুই হাত দিয়ে পথ রোধ করে বলল, "না না, তুমি যেতে পারবে না। ওগো, তুমি আমাকে ফেলে যেতে পারবে না। আমার বাছাদের জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করছে। আমি যাবই যাবই যাব ওদের দেখতে। কুশল? কুশল কোথায়? কুশল?"

আমাদের কারো নজর ছিল না কুশল কখন এক সময় ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। গিয়ে বেবীর ঘরে তার খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে

বসেছে। এক দৃষ্টে চেয়ে আছে তার দিকে আর হু হু করে চোখের জল ঝরাচ্ছে। কী করুণ তার দৃষ্টি। কী কাতর তার মুখভাব!

গ্রাৎসিয়া তাকে টেনে জড়িয়ে ধরল। "আমার শ্রেষ্ঠ স্বামী! আমার শ্রেষ্ঠ সন্তানের পিতা। কেন তুমি কাঁদছ! কী তোমার ব্যথা! আমি কি তোমাকে সুখী করিনি! তোমার জন্যেই তো মরণের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে মা হয়েছি আবার। তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব ভেবেছ! খোকাকে ছেড়ে বাঁচতে পারি আমি!"

কুশল পুরুষ মানুষ। রাগ করবে। খুন করবে। কিন্তু কোথায় তার লক্ষণ! অবোধ শিশুর মতো গ্রাৎসিয়ার কাঁধে মাথা রেখে অশ্রু বর্ষণ করছে। কী ভাবছে কে জানে! বোধ হয় ভাবছে, গ্রাৎসিয়া, তোমার উপরেই সিদ্ধান্তের ভার। তুমিই স্থির করবে থাকবে না যাবে। ছাড়বে না রাখবে। আমি নিষ্ক্রিয়।

৪

সেদিন আমি আর অপেক্ষা করলুম না। কুশলকে ও ভাবে ফেলে আসতে মন কেমন করছিল, কিন্তু হাতে কাজ ছিল। তা ছাড়া সমস্যার কোনো আশু সমাধান ছিল না।

দেশে ফিরে কুশলকে ভুলে গেছলুম। জীবনের স্রোত আমাকে কত ঘাটে যে নিয়ে গেল, খর স্রোত আমাকে ঘাটে ভিড়তে দিল না। ক্বচিৎ কখনো স্বপ্নের মতো মনে পড়ে যেত কুশলকে আর তার লাবেল-কে আর তাদের দু'জনের রূপবান শিশু অনিন্দ্যকে। সে আর কতক্ষণের জন্যে! একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে সেটুকু অবকাশ দিচ্ছে কে!

পাঁচ বছর কি ছ'বছর পরে কলকাতায় রাস্তায় কুশলের সঙ্গে মুখো-

মুখি। চৌরঙ্গীর আর্ট স্কুলের সামনে। বিশুদ্ধ বাঙালী পোশাক। হঠাৎ চিনতে পারিনি আমি। সেই চিনল প্রথমে। বলল, "আমি কুশল মল্লিক! এবার চিনলে?"

আমি লজ্জিত হয়ে বললুম, "চিনেছি ঠিকই, তবে ভাবতেই পারিনি যে তুমি।"

চৌরঙ্গীর ফুটপাথের উপর সেদিন টহলদারি করলুম আমরা দু'জনে। এ মাথা থেকে ও মাথা। দু'জনেরই তাড়া ছিল। সেইজন্যে কোনো রেস্টোরাণ্টে যাওয়া হয়নি। গেলে যে ওর চেয়ে বেশী সময় ক্ষয় হতো তা নয়। কিন্তু গোড়ায় সেটা খেয়াল হয়নি।

কুশলের কাছে সমস্ত শুনলুম।

জোভানি ছিলেন সে রাত্রে। গ্রাৎসিয়া ওঁকে হোটেলে ফিরতে দেয়নি। বসবার ঘরে বিছানা পাতা হলো ওঁর জন্যে। গ্রাৎসিয়া একবার ওঁর ঘরে যায়, একবার কুশলের ঘরে। সারারাত এঘর ওঘর করে কাটায়। কুশলের চোখে ঘুম আসেনি। চোখ দিয়ে জলপ্রপাত নেমেছিল। একটা মানুষের সারা সত্তা জুড়ে চলছিল গঙ্গাবতরণ। এত জল ছিল তার প্রাণগঙ্গায়। শুধু জল কেন! হাওয়া ডেকে যাচ্ছিল শোঁ শোঁ করে। দীর্ঘশ্বাসের হাওয়া।

বেচারী বাড়ী ফিরেছিল দিনের শেষে। কোথায় স্ত্রীর সঙ্গে বসে গল্প করবে! ছেলেকে কোলে নেবে! দু'জনকে একসঙ্গে আদর করবে! তা নয়! বিনা মেঘে বজ্রপাত। কোথায় শুতে যাবে স্ত্রীর সঙ্গে! তা নয়। স্ত্রী চলেছেন অভিসারে। সে যে কী সুতীব্র যন্ত্রণা! কী জ্বালা! তুলনা নেই তার। বোধহয় যমযন্ত্রণাও তার মতো নয়।

পরের দিন সকালে উঠে কুশল বলে, "এ রকম চলতে পারে না।

চললে আমি পাগল হয়ে যাব। জোভানিকে নিয়ে তুমি থাকো। খোকনকে নিয়ে আমি যাই।"

গ্রাৎসিয়া অবাক হয়ে বলল, "সে কী! কোথায় যাবে তোমরা? ভারতবর্ষে? তোমার বন্ধুর সঙ্গে বুঝি? ওমা, তলে তলে এত! লোকটা এইজন্যে এসেছিল?"

তারপর যা হয়ে থাকে। বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া। খোকনের মা তাকে ছাড়বে না, তাকে না দেখে তার বাপই বা থাকবে কী করে! ওদিকে জোভানি যে নির্দিষ্ট দিনে ইটালী রওনা হবেন তার জো নেই। আবার ইটালীতে যে দুটি সন্তান ছিল তাদের সঙ্গে কত শীগ্গীর দেখা হবে তার জন্যে গ্রাৎসিয়ার ব্যাকুলতাও অনন্ত। আবার কুশলকে একা ফেলে যেতেও তার মন সরে না।

দোটানা বলে একটা কথা আছে। এ যে তেটানা কি চৌটানা! এমন সঙ্কটেও মানুষ পড়ে! প্রোটেস্টাণ্ট হলে ডিভোর্সের আশ্রয় নিত। কিন্তু রোমান ক্যাথলিকদের পক্ষে ওটা অভাব্য। জোভানির সঙ্গে বিবাহ এখনো বলবৎ রয়েছে। ছিন্ন করতে হলে করতে হয় কুশলের সঙ্গে সম্বন্ধ। সমাজের চোখে ওটা বিবাহই নয়। ধর্মের চোখে ওটা ব্যভিচার। আইনের চোখে ওটা বিগ্যামি।

সব চেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে অনিন্দ্যের অবস্থা। কুশলের ঔরসে তার জন্ম। কিন্তু যার গর্ভে তার জন্ম সে জোভানির পরিণীতা। সুতরাং আইনের বিচারে সে জোভানির সন্তান! তার পদবী মল্লিক নয়। মারিনেত্তি। হাজার নালিশ করলেও মল্লিক তার অভিভাবক হতে পারবে না। এক যদি মারিনেত্তি দয়া করে তাকে মল্লিকের হাতে দেয়। কিন্তু জোভানি দয়া করতে রাজী হলেও গ্রাৎসিয়া নারাজ। কোলের

বাছাকে সে কোন্ নার্সের কবলে সঁপে দেবে! কুশল যদি আর কাউকে বিয়ে করে তাহলে সতীনের খপ্পরে পড়বে তার একমাত্র পুত্রসন্তান! ওহ্! কী নিষ্ঠুর সম্ভাবনা!

শেষ পর্যন্ত হলো এই যে জোভানির সঙ্গে গ্রাৎসিয়া চলল ঘরের বৌ ঘরে। গ্রাৎসিয়ার সঙ্গে অনিন্দ্য চলল কোলের বাছা কোলে। অনিন্দ্যর সঙ্গে কুশল চলল ইটালীর চিত্রশালায় কাজ করতে। জোভানি তাকে কথা দিয়েছিলেন কাজ জুটিয়ে দেবেন।

কাজ জোটানো অত সহজ নয়। বেকার বসে থাকতে হলো কুশলকে। তার সঞ্চয় যা ছিল হোটেলের বিল মেটাতে মেটাতে গেল ফুরিয়ে। লণ্ডনে ফিরে আসার জন্যে তার শুভার্থীরা তাকে চিঠি লিখতে লাগলেন। লণ্ডনে তাকে অনেকে চেনে। মিলানে চেনে কে! লণ্ডন তার যথাস্থান। মিলান নিতান্তই পরদেশ। যদিও তার প্রিয়া থাকে সেখানে, তার নন্দন থাকে সেখানে।

ইচ্ছা করলেই যে ওদের সঙ্গে দেখা হবে তা নয়। মারিনেত্তির মর্মে ভয় আবার হয়তো ওরা পালাবে। কড়া পাহারায় রাখেন স্ত্রীকে। দেখাশোনার অনুমতি দেন সাত দিনে একবার। ছেলেকে কোলে নিয়ে একশোবার চুমু খায় কুশল। কিন্তু স্ত্রীকে আদর করতে পায় না। পাহারা যে। সে যেন জেলকয়েদী। সাক্ষাতের অনুমতি পেয়েছে, কিন্তু সোহাগের নয়।

ওদিকে রয়াল কলেজ থেকে ওরা তাগাদা দিচ্ছিল, দেরি হচ্ছে কেন? অমন করলে একটা বছর কামাই হবে। এদিকে হোটেল থেকে এরা তাগাদা দিচ্ছিল, বিল জমছে কেন? অমন করলে এখানে পোষাবে না। অস্থির হয়ে উঠছিল কুশল। সাক্ষাৎকালে অস্থিরতা ব্যক্ত না করে পারছিল না।

একদিন চোরাই ভাবে দেখা করতে এলো গ্রাৎসিয়া। কোনখান থেকে এক তাড়া নোট বার করে বলল, "এই নাও। হোটেলের পাওনা চুকিয়ে দাও।"

কুশল তার হাত চেপে ধরে বলল, "আমাকে তুমি কি ঠাউরেছ? আমি কি একটা জিগোলো?" তার নিজের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছিল।

বাক্য অনেক সময় বুলেটের মতো বেঁধে। গ্রাৎসিয়া একেবারে টলে পড়ল। ঘাড় ঘোরানো হাঁসের মতো। কী একটা আর্তনাদ মাঝ পথে থেমে গেল।

কুশল কিন্তু বুলেটের পর বুলেট চালাতে লাগলো। "আমি কি তোমার বিবাহিত বর, না ভাড়াটে নাগর? কী পেয়েছ আমাকে?" তার পর, "ছেলে বড় হলে কী ভাববে আমাকে? শ্রদ্ধা করবে? ক্ষমা করবে? এমন জানলে ছেলের বাপ হতুম কখনো?"

হৃদয়হীনতার চরমে পৌঁছেও নিরস্ত হলো না কুশল। "আমার ছেলে আমাকে দাও। এ টাকা তুমি নাও। আজকেই হয়ে যাক শোধ-বোধ।"

সে এক দৃশ্য। গ্রাৎসিয়া যেন মরে গেছল। তার মুখে মড়ার মুখের হাসি। অবশেষে কুশলের জ্ঞান হলো যে ছেলের মা যদি মারা যায় ছেলে কেমন করে বাঁচবে! আর গ্রাৎসিয়া কি কেবল ছেলের মা বলেই প্রিয়। নিজ গুণে প্রিয় নয়?

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল কুশল। যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে। বেশ তো ছিল ওরা তিনটিতে। পাটনী হীথ লেনের ফ্ল্যাটে। কেন এমন হলো? আবার কবে তিনটিতে মিলে নীড় বাঁধবে! বাপ-পাখী, মা-পাখী

ও ছানা। এ সুখের জন্যে সব ছেড়েছুড়ে দিতে রাজী আছে কুশল। স্বজন, ধর্ম, উচ্চাভিলাষ।

"আমি একটা পাগল। আমার কথায় কান দিয়ো না, লক্ষ্মীটি!" কুশল বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করল। "আমি কি তোমাকে ওসব বলতে চেয়েছি? ঐ টাকার তাড়া দেখেই না আমার পিত্তি জ্বলে গেল। ও টাকা আমার নয়, আমার স্ত্রীর নয়, তবে কার? কে আমাকে দিচ্ছে?"

"ওটা তোমারই টাকা।" গ্রাৎসিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলল। "তুমি আমাকে ও টাকা খরচ করতে দিয়েছিলে। আমি খরচ করিনি। ফ্রক আমি নিজের হাতে বানাতুম। তুমি ভাবতে দোকান থেকে কেনা। তুমি সারাদিন বাইরে কাটাতে। দেখতে না তো আমি কী বানাই।"

কুশল তাকে আদর করতে গেল সে হাত ছাড়িয়ে নিল। করুণ স্বরে বলল, "আমিও এই ক'মাস ঠেকে শিখেছি, এরকমভাবে চলতে পারে না। দুঃখ আমাকে পেতেই হবে, যার সঙ্গে যাই না কেন। তোমার সঙ্গে গেলেও দুঃখ, জোভানির সঙ্গে গেলেও তাই। কিসে কম দুঃখ সে আমি জানিনে, কেউ জানতে পারে না, কেননা জীবনে কত কী ঘটে যা অপ্রত্যাশিত। দেখতে হবে কিসে কম অমঙ্গল। আমার সিদ্ধান্ত এই যে বাপ মা আমাকে যার হাতে সঁপে দিয়েছেন তার ঘর করাতেই কম অমঙ্গল।"

এত কথা এক নিঃশ্বাসে কখনো সে বলে না। বলতে বলতে চোখ মুছতে থাকল। মোহন হেসে বলল, "ছেলের বাপের কি কোনো দাবী নেই? আছে বই-কি। ছেলে যখন বড় হবে তখন বলব সব বৃত্তান্ত। বলব তুমি লণ্ডনে জন্মেছ। তোমার বার্থ সার্টিফিকেটে লেখা আছে

তোমার পিতার নাম কুশল, তোমার পদবী মল্লিক। ইচ্ছা করলে তুমি ভারতবর্ষে চলে যেতে পারো। গিয়ে দেখবে তোমার পিতা সে দেশের মহাশিল্পী। তোমার জন্যে তিনি পথ চেয়ে আছেন। তোমাকে নিজের হাতে গড়বেন। তুমি হবে সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য বংশধর।"

কুশলেরও বুক ভেঙে যাচ্ছিল এ কথা শুনে। গ্রাৎসিয়ার তো ভেঙে যাচ্ছিলই এ কথা বলতে। দু' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে মনটাকে শক্ত করে বাঁধল। এই ভালো, এই ভালো। এর চেয়ে ভালো এ জীবনে আশা করা যায় না।

তারপর বিদায়। শেষ বার তাদের সাক্ষাৎ হয় মারিনেত্তির ভবনে। গ্রাৎসিয়া তখন মনে প্রাণে মারিনেত্তির গৃহিণী। মামুলি শিষ্টাচার বিনিময়ের পর যবনিকা পতন। শিশুটি মায়ের কোল থেকে লাফিয়ে বাপের কোলে এলো, কিন্তু বাপের প্রাণান্তিক পেষণে অতিষ্ঠ হয়ে মায়ের দিকে দু' হাত বাড়ালো। কুশল তাকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "বেঁচে থাকুক, দীর্ঘজীবী হোক। আবার দেখা হবে নিশ্চয়।"

৫

কুশলের কাহিনী শুনে আমি নীরবতা ভঙ্গ করলুম। "এখন তুমি আছো কোথায় ?"

"বম্বেতে স্টুডিও খুলেছি। কলকাতায় মুখ দেখাতে পারিনে। জানে কেউ কেউ এ ঘটনা।"

"অনিন্দ্য কেমন আছে ?"

"ভালোই ! তার ফোটো দেখবে ? এই দেখ, কত বড়টি হয়েছে।"

"আর লা বেল ?"

"ভগবান জানেন। খামে বন্ধ করে খোকনের ফোটো পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু চিঠি লেখে না।"

আর একটা খবর আমার জানবার ছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, "বিয়ে করেছ?"

"না। এ জীবনে করব না।"

"কেন? কেন? এ পাগলামি কেন?"

"পাগলামি নয়। ছেলে বড় হলে কী মনে করবে! আসবে কেন আমার ঘরে। ও কি কম অভিমানী হবে ভেবেছ! আমি তো ভয়ে মরে আছি কোনদিন কে ওকে অপমান করবে কালো বলে! কাকের বাসায় কোকিল বলে! না, কাকের বাসায় নয়, কাকাতুয়ার বাসায়। অপমান সইতে না পেরে ও যদি নিরুদ্দেশ হয়! যদি আত্মহত্যা করে! তা হলে কি আমি বাঁচব!"

কুশলকে তার পরে আর দেখিনি। অনেকদিন খবর রাখিনে ওর। শুনেছি ইউরোপে ফিরে যায় মহাযুদ্ধের আগে। ওর ছেলে বেঁচে থাকলে গত মাসে পঁচিশে পড়েছে। কে জানে কার কাছে এখন! সে কি জানে তার নাম রেখেছিল কে?

(১৯৫৩-৫৪)

অন্নদাশঙ্কর রায়

ছোটগল্পের বই

প্রকৃতির পরিহাস

মনপবন

যৌবনজ্বালা

ছোট উপন্যাস

অসমাপিকা

পাহাড়ী

আগুন নিয়ে খেলা

পুতুল নিয়ে খেলা

না

কন্যা

ভ্রমণের বই

পথে প্রবাসে

ইউরোপের চিঠি